অরণ্য

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১-০৫. মশারির ভেতর একটা মশা 2
০৬-১০. রহমান সাহেব আজ অফিসে 42
১১-১৫. বেলা এগারোটায় সোবাহান 89
১৬-২০. বুলুর অবস্থা এতটা খারাপ 133

০১-০৫. মশারির ভেতর একটা মশা

মশারির ভেতর একটা মশা ঢুকে গেছে।

পাতলা ছিপছিপে বুদ্ধিমান একটা মশা। কোথাও বসলেই তাকে মরতে হবে এটি জানে বলেই কোথাও বসছে না। ক্রমাগত উড়ছে।

সোবাহান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। নিশ্চয়ই একসময় সে বসবে। কিন্তু বসছে না, অসম্ভব জীবনীশক্তি। সোবাহানের মাথায় আজগুবি ভাবনা আসতে লাগল–এই মশাটির বয়স কত? এ কি বিবাহিত? এর ছেলেমেয়ে আছে কি? ওদের একা ফেলে সে মরবার জন্যে মশারির ভেতর ঢুকল? মৃত্যুর পর ওর আত্মীয়স্বজন কাঁদবে কি? নাকি প্রেম ভালোবাসা এসব শুধু মানুষের জন্যেই? বোধহয় না। একবার সোবাহানের ছোটচাচা একটা কাক মেরে গাবগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে কাকটির মৃত্যুসংবাদ। প্রচারিত হয়ে গেল। হাজার হাজার কাক বাড়ির চারপাশে কা কা করতে লাগল। ভয়াবহ। ব্যাপার।

এই মশাটির মৃত্যুসংবাদও কি অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে? অযুত নিযুত মশা পিন পিন শব্দে উড়ে আসবে? খুব সম্ভব না। নিচুস্তরের কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা

নেই, আর থাকলেও তাতে মৃত্যুর কোনো ভূমিকা নেই।

একসময় মশাটি মশারির এক কোনায় স্থির হয়ে বসল। তার গায়ের রঙ হালকা নীল। পাখার নিচের দিকটা চকচকে খয়েরি। মশারা এমন বাহারি হয় তা সোবাহানের জানা ছিল

না। সোবাহান মনে মনে বলল, তুমি মরতে যাচ্ছ। মরবার আগে তোমার কি কিছু বলার আছে?

মশাটি পাখা নাড়ল। মনের কথা বুঝতে পারে নাকি? টেলিপ্যাথি? 'নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গরা ভাবের আদানপ্রদান টেলিপ্যাথির মাধ্যমে করিয়া থাকে। কোথায় যেন পড়েছিল কথাটা। সাপ্তাহিক কাগজেই বোধহয়। সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে অদ্ভুত সব খবর ছাপা হয়। একবার এক কাগজে ধর্মপ্রাণ একটা খেজুরগাছের ছবি ছাপা হলো। এই গাছটা নাকি নামাজের সময় হলেই পশ্চিমদিকে হেলে সেজদা দেয়। গাছগাছালির মধ্যেও ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে? ইসলাম ধর্মের অনুসারী এই গাছটি খুব দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মানুষের অধিকাংশ ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে।

মশাটি সম্ভবত স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েছে। একটুও নড়ছে না। সোবাহানকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে দেখে তার ছাইবর্ণের একটি পাখা শুধু কাপল। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গরা মানুষকে কীভাবে গ্রহণ করে এটি কোনোদিন জানা হবে না। ঈষৎ অন্যমনস্কতার পর মশাটিকে সোবাহান দু'হাতে পিষে ফেলল।

পিন পিন শব্দ হচ্ছে নাকি? অযুত নিযুত মশা কি উড়ে আসছে? যাদের রঙ নীলাভ, পাখার নিচটায় নরম খয়েরি রঙ।

.

০২.

ঢাকা শহরে মোট কতজন সোবাহান আছে! সোবাহান আলি, সোবাহান মোল্লা, আহমেদ সোবাহান। দশ-পনেরো হাজার তো হবেই। এদের কেউ কেউ ঘুমোতে যায় অনেক রাতে। ঘুম আসে না। রাত জেগে নানান রকম স্বপ্ন দেখতে এদের বড় ভালো লাগে। যে সমস্ত মশা পিন পিন শব্দে এদের স্বপ্নে বাধা সৃষ্টি করে, এরা উৎসাহের সঙ্গে তাদের পিষে মেরে ফেলে। হাতে রক্তের দাগ নিয়ে ঘুমোতে গেলে এদের সুন্দ্রিা হয়।

কিন্তু আমাদের সোবাহান নীল রঙের মশাটি মেরে মন খারাপ করে বসে রইল। আগামীকাল সাড়ে দশটায় একটা চাকরির ব্যাপারে তার এক জায়গায় যাওয়ার কথা। চাকরিটি হলেও হতে পারে। এরকম অবস্থায় মন দুর্বল থাকে। অকারণ প্রাণিহত্যায় চাপা একটি অপরাধ বোধ হয়। সোবাহান মশারির ভেতর উবু হয়ে থাকে। পাশের বেডের। জলিল সাহেব তখন কথা বলেন, ঘুমান না কেন?

বড় মশা।

মশারির ভেতর আবার মশা কী?

সোবাহান কিছু বলে না। জলিল সাহেব মশা নিয়ে একটা বস্তাপচা ছড়া বলেন—দিনে মাছি রাতে মশা, আমাদের স্বর্গে যাওয়ার দশা। সোবাহান বিরক্তি বোধ করে। কোনো উত্তর দেয় না।

ঘুমিয়ে পড়েন ভাই, ঘুমিয়ে পড়েন। মশার আদমশুমারি করে কোনো ফায়দা নাই। ঠিক কি না বলেন?

জি, তা ঠিক।

গরমটাও আজ কম, ভালো ঘুম হবে।

জি।

শেষরাতের দিকে বৃষ্টি হবে। এই ধরেন তিনটা সাড়ে তিনটা।

কীভাবে বুঝলেন?

বুঝি বুঝি, বয়স তো কম হয় নাই।

জলিল সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে গলা টেনে টেনে হাসেন। এর মধ্যে হাসির কী আছে সোবাহান বুঝতে পারে না। সে শুয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘুম আসে না। মাথার ওপর ষাট পাওয়ারের একটা বাল্ব। ঝকঝক করে চারদিক। যত রাত বাড়ছে আলো তত বাড়ছে। ঘুম আসার প্রশ্ন ওঠে না। তার চোখ কড়কড় করে।

বাতি জ্বালিয়ে রাখলে অসুবিধা হয় নাকি সোবাহান সাহেব?

জি-না।

চোর আর বেশ্যা। হা হা হা।

সোবাহান বহু কষ্টে রাগ সামলায়। রাতদুপুরে এ ধরনের কথাবার্তার কী মানে থাকতে পারে? শুয়ে পড়লেই হয়।

বেশ্যাগুলি অন্ধকারে বসে কী করে জানেন নাকি সাহেব?

জি-না। জানি না।

জলিল সাহেব অঙ্গভঙ্গিসহ একটা কুৎসিত কথা বলে গলা টেনে টেনে হাসতে থাকেন। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেই লোকজন অশ্লীল কথা বলতে ভালোবাসে। জলিল সাহেবের বয়স পঞ্চাশ এখনো হয়নি। অবশ্যি জুলপির সমস্ত চুল পেকে গেছে। মানুষের জুলপি কি আগে বুড়ো হয়ে যায়? হয়তো যায়। সোবাহানের জানতে ইচ্ছে করে।

একটা বেশ্যা মাগি আর একটা রেগুলার মাগি—এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী বলেন

দেখি?

সোবাহান চুপ করে থাকে।

পারবেন না? আপনি দেখি সাহেব কিছুই জানেন না। হা হা হা।

ডিফারেন্সটা সম্পর্কে একটা রসালো জিনিস জলিল সাহেব আধা ঘণ্টা ধরে বলার পর বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে গেলেন। বাতি নেভাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মশা সোবাহানের কানের কাছে পিন পিন করতে লাগল। মশার আত্মা নাকি? সেই মৃত মশাটিই কি ফিরে এসেছে? জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। ঘুম এল না। মশাটি বিরক্ত করতে লাগল।

একবার উঠে বাতি জ্বালাল। মশারির ভেতর কিছুই নেই। কিন্তু ঘুমোতে গেলেই তাকে পাওয়া যাচ্ছে–পি পি পিন পিন। পিঁ পিঁ পিন পিন।

ঘুম আসছে না, ঘুম আসছে না। অসহ্য গুমট। হাওয়া নেই, এক ফোঁটা হাওয়া নেই। সোবাহান একসময় দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কোথাও হাওয়া নেই। আকাশে মেঘ আছে কি? সে তাকাল আকাশের দিকে। মেঘশূন্য আকাশ। ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না। ভেতরের বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কে কাঁদছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনসুর সাহেবের স্ত্রী? না তার ছোট শালী? এ বাড়িতে মাঝে মাঝে এরকম অস্বস্তিকর কান্না শোনা যায়। কে কাঁদে কে জানে?

সোবাহান! সোবাহান সাহেব!

জি।

একটু আসেন ভিতরে।

কী হয়েছে?

আরে ভাই আসেন না। বিনা কারণে কেউ ডাকে না।

সোবাহান ঘরে ঢুকে দেখল, জলিল সাহেব বমি করে তার বিছানার একাংশ ভাসিয়ে চোখ বড় বড় করে বসে আছেন। ঘরময় কটু ঝাঁঝালো গন্ধ। বাতাস ভারী হয়ে আছে।

কী হয়েছে?

কিছু না।

আপনার কি শরীর খারাপ নাকি?

না।

বমি করে তো ঘর ভাসিয়ে ফেলেছেন।

সন্ধ্যার পর এক ঢোক খেয়েছিলাম। সস্তার জিনিস। সস্তার তিন অবস্থা। প্রথম অবস্থায় নেশা। দ্বিতীয় অবস্থায় বমি। তৃতীয় অবস্থায় আবার বমি।

বলতে বলতেই মুখ ভর্তি করে আবার বমি করলেন। তার হিক্কা উঠতে লাগল। সোবাহান কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

সোবাহান সাহেব।

জি।

পানি আনেন। হা করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভয় নাই, আমি নিজেই পরিষ্কার করব। নিজের গা নিজেই পরিষ্কার করতে হয়। এটা কপালের লিখন। একটা ঝাটা জোগাড় করেন।

সব পরিষ্কার টরিষ্কার করে তারা যখন ঘুমোতে গেল তখন কেঁপে বৃষ্টি নামল। জলিল উফুল্ল স্বরে বললেন, বৃষ্টি নামল–দেখলেন তো?

জি দেখলাম।

বলেছিলাম না বৃষ্টি হবে?

হুঁ বলেছিলেন।

জলিল সাহেব গলা টেনে হাসতে লাগলেন।

সোবাহান সাহেব!

জি।

ঠিক আছে ঘুমান। আমি একটু বসি বারান্দায়।

জলিল সাহেব মশারি থেকে বের হয়ে এলেন। ভেতরবাড়ি থেকে কান্না শোনা যাচ্ছে। সোবাহান মৃদুস্বরে বলল, কে কাঁদে জানেন?

জলিল সাহেব উত্তর দিলেন না। সোবাহান বলল, প্রায়ই শুনি।

জলিল সাহেব ঠান্ডাস্বরে বললেন, যার ইচ্ছা সে কাঁদুক, কিছু যায় আসে না। আমাদের একটা ঘর সাবলেট দিয়েছে আমরা আছি। মাসের শেষে দেড়শ টাকা ফেলে দেই, ব্যস। যার ইচ্ছা কাঁদুক, কী যায় আসে বলেন? কিছুই আসে যায় না।

.

জলিল সাহেব দরজা খুলে বারান্দায় বসে রইলেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। শীতল হাওয়া দিচ্ছে। কানের কাছে মশা পিন পিন করছে না। কিন্তু ভেতর বাড়িতে কেউ একজন কাঁদছে। প্রায়ই সে কাঁদে। কেন কাঁদে কে জানে। শুনতে ভালো লাগে না। মেয়েদের কান্নায় ঘুমপাড়ানি কিছু আছে। সোবাহানের ঘুম পেতে থাকে। ঘুম আসার সময়টা বেশ সুন্দর। গভীর কোনো নির্জন দিঘিতে ডুবে যাওয়ার সঙ্গে এর একটা মিল আছে। মিলটি সোবাহান ধরতে পারে, কারণ সে একবার সত্যি সত্যি ডুবে যেতে বসেছিল। শুরুটাই ভয়ের। তারপর কোনো ভয় নেই–আলো কমে যেতে শুরু করে, শব্দ কমে যেতে শুরু করে।

ব্রাদার, ঘুমিয়ে পড়লেন? এই সোবাহান সাহেব!

না, ঘুমাইনি। কেন?

বমি করার পর পেটে আর কিছু নাই। ক্ষিদে লেগে গেছে।

আমাকে বলে কী লাভ?

তা ঠিক। ঘুমান। আমি বরং এক গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ি, কী বলেন?

খান। ইচ্ছে হলে খান।

খালিপেটে পানি খেলে আবার বমি হবে না তো?

সোবাহান জবাব দিল না। এই লোকটির সঙ্গে আর থাকা যাচ্ছে না। আগের মেসটিতেই ফিরে যেতে হবে। অসহ্য! সোবাহান ঠিক করল কাল ভোরে প্রথম যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে–কুমিল্লা বোর্ডিং-এ ফিরে যাবে।

কিন্তু সে নিশ্চিত জানে এটা করা হবে না। কারণ সকালে তাকে যেতে হবে চাকরির ব্যাপারে। তারপর আর উৎসাহ থাকবে না। তাছাড়া কারও সঙ্গে বেশি দিন থাকলেই একটা মায়া জন্মে যায়। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। জলিল সাহেবের সঙ্গে সোবাহান আছে প্রায় পাঁচ বছর ধরে। প্রথম দু'বছর বেঙ্গল মেস হাউসে। বাকি তিন বছর কুমিল্লা বোর্ডিং এ। এবং এখন শ্যামলীর এই বাড়িতে। জলিল সাহেবের ব্যবস্থা। সোবাহান আসতে। চায়নি। জলিল সাহেব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়েছেন।

মেসে সারা জীবন পড়ে থাকবেন নাকি! একটা ফ্যামিলির সঙ্গে এ্যাটাচড থাকা ভালো। ঘরের রান্না খাবেন। তার টেস্টই অন্যরকম। অসময়ে এক কাপ চা খেতে চাইলেন, জাস্ট গিয়ে বলবেন–ভাবি, এক কাপ চা। ওমনি চা এসে যাবে। সঙ্গে একটা বিসকিট কিংবা এক প্লেট মুড়ি ভাজা।

জলিল সাহেবের মিষ্টি কথার কোনোটি সত্যি হয়নি। তিনি অবশ্যি অনেক চেষ্টা করেছিলেন পেইংগেস্ট হতে। কিন্তু বাড়িওয়ালা মনসুর সাহেবের স্ত্রী খুব পর্দানশীন। এই যে দু'টি লোক বাড়ি সাবলেট নিয়ে আছে, তাদের সঙ্গে এখনো এই মহিলাটির কোনো কথা হয়নি। একবার শুধু এক বড় জামবাটি ভর্তি পায়েস পাঠিয়েছিলেন। সেই পায়েস খেয়ে জলিল সাহেবের পেট নেমে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন–পায়েসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফেলে দেওয়ার বদলে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে। মহা হারামি! এখানে থাকা যাবে না রে ভাই। কুমিল্লা বোর্ডিংই ভালো। সেখানে ফিরতে হবে। কপালের লিখন।

কিন্তু ফিরে যাওয়া হচ্ছে না। দেখতে দেখতে এখানেও তিন মাস হয়ে গেল। আরও কিছুদিন গেলে এ জায়গাটার ওপরও একটা মায়া পড়ে যাবে। ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করবে না। মায়া বড় সাংঘাতিক জিনিস।

.

০৩.

দশটায় আসার কথা সোবাহান নটায় এসেছে। বসার জায়গাটা ভালো। বেতের গদিওয়ালা চেয়ার ইউ আকৃতিতে সাজানো। মাঝখানে বেমানান আধুনিক একটা কাঁচের টেবিল। টেবিলের ওপর দু'টি অ্যাশট্রে–এত সুন্দর দেখতে যে, গোপনে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলার ইচ্ছা বহু কষ্টে দমন করতে হয়। দেয়ালে তিনটি বিভিন্ন মাপের তেলরঙ ছবি। প্রতিটিই দেখতে কুৎসিত। ফ্রেমগুলির জন্যেই বোধ করি ওদের সহ্য করা যায়। সোবাহান মাঝখানের একটি চেয়ারে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বসে রইল। এর মধ্যে তিনবার। উঠে বারান্দায় গেল থুথু ফেলতে। আজ কেন জানি মুখে ক্রমাগত থুথু জমছে। বারোটার। সময়

জানা গেল যার জন্যে বসা থাকা সেই এস. রহমান সাহেব আজ আসবেন না। তার। শরীর খারাপ। সোবাহান ইনকোয়ারিতে বসে থাকা বেঁটে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, কাল আসব? মেয়েটি হাসিমুখে বলল, প্রয়োজন থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন।

রহমান সাহেব কি কাল আসবেন?

শরীর ভালো হলে আসবেন। আপনি কি চা খেয়েছেন?

সোবাহান চমকায়। চায়ের কথা আসছে কোত্থেকে? মেয়েটি শান্তস্বরে বলল, যে সব গেস্ট এখানে অপেক্ষা করেন তাদের চা দেওয়ার নিয়ম আছে, আপনাকে দেয় নাই?

জি-না। তাছাড়া আমি গেস্ট না। আমি চাকরির খোঁজে এসেছি।

মেয়েটি কৌতূহলী হলো। ফোন বাজছিল সে সেদিকে লক্ষ না করে বলল, রহমান সাহেব আপনাকে চাকরি দেবেন এমন কিছু বলেছেন?

না, দেখা করতে বলেছেন।

মেয়েটি টেলিফোন তুলে কাকে যেন ইশারা করল। এক কাপ চা এবং এক পিস ফ্রুট কেক এসে পড়ল। চমৎকার ফ্রুট কেক। চা-টাও বেশ ভালো। চিনি কম। কিন্তু চিনি দিতে বলাটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মেয়েটি টেলিফোন নামিয়ে খুব মিষ্টি করে বলল, খান, কেক খান। কাল কি আসবেন?

জি।

উনি অবশ্যি ইচ্ছা করলে চাকরি দিতে পারেন। আপনি এখন কোনো চাকরি টাকরি করছেন?

না।

থাকেন কোথায়?

শ্যামলী।

কথাবার্তা আর হলো না। আবার একটি টেলিফোন এল। মেয়েটি অবিকল ইংরেজদের মতো গলায় ইংরেজি বলতে লাগল। মাঝে মাঝে চাপা হাসি। যে চা কেক। খাইয়েছে তাকে কিছু না বলে চলে যাওয়া যায় না। সোবাহান অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কথা শেষ হচ্ছে না। সোবাহান আন্দাজ করতে চেষ্টা করল যার সঙ্গে কথা হচ্ছে সে ছেলে না মেয়ে। মেয়েই হবে। ছেলেরা এত সময় কথা বলতে পারে না।

বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। জিজ্ঞেস করবে কাকে? রিসিপশনের মেয়েটির চেহারা মন্দ নয়। ফর্সা মেয়েরা একটু বেঁটে হলেও খারাপ লাগে না। কিন্তু কালো ও বেঁটে এ দুয়ের কম্বিনেশন ভয়াবহ। কালো মেয়েদের লম্বা হতে হয় এবং লম্বা চুল থাকতে হয়।

মেয়েটি টেলিফোন নামিয়ে রেখে তরতর করে দোতলায় উঠে গেল। আর নামার নাম নেই। সোবাহান আরও পঁচিশ মিনিটের মতো অপেক্ষা করল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সেজন্যেই মাথায় এখন চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে। বাসায় ফিরে টেনে একটা ঘুম দিতে হবে। রিসিপশনিস্ট

মেয়েটির নাম কী কে জানে। মাঝে মাঝে সুন্দরী মেয়েদের কুৎসিত সব নাম থাকে। মুন্সিগঞ্জের এসডিও সাহেবের একটি মেয়ে ছিল জলপরীর মতো। নাম তাসকিন। কোনো মানে হয় না। একজন সুন্দরী মেয়ের সুন্দর একটা নাম থাকা দরকার। তাসকিন ফাসকিন নয়, ওর নাম হওয়া উচিত বিপাশা কিংবা জরী।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি নেমে এসে ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনি এখনো যাননি?

জি-না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

কেন? আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন কেন?

আপনি যত্ন করে চা খাওয়ালেন। না বলে চলে যাই কীভাবে?

যত্ন করে চা খাওয়ালেন মানে? এখানে যে আসে তাকেই চা খাওয়ানো হয়।

সোবাহান বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। সুন্দরী মেয়েরা অকারণে রাগে। এই মেয়েটি যদি কালো, রোগা হতো এবং তার মুখে যদি বসন্তের দাগ থাকত তাহলে সোবাহানের কথায় সে খুশিই হতো। খুশি হওয়ার মতোই কথা।

একজন মোটামুটি সুদর্শন যুবক অপেক্ষা করছিল। হতে পারে যুবকটি চাকরিপ্রার্থী। কাপড়চোপড় ভালো নয়। সারা রাত অঘুমো থাকায় চোখেমুখে ক্লান্তি, তাতে কিছু যায় আসে কি? কিছুই যায় আসে না।

.

সোবাহানকে দেখেই জলিল সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেন সারা দিন? আপনার ভাই এসে বসে আছেন সকাল থেকে।

সোবাহান উৎসাহ দেখাল না। তার ভাই মাসে একবার করে আসেন। তার আসা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়।

ভাত খেতে গেছেন রশীদের হোটেলে। ওইখানে দেখা পাবেন।

সোবাহান ধীরেসুস্থে জামা কাপড় খুলল। গা ঘামে চট চট করছে। জলিল সাহেব বললেন, পানি নাই, গোসল করতে পারবেন না।

পানি নাই?

এক বালতি ছিল–আপনার ভাই শেষ করেছেন। গ্রামের মানুষ বেশি পানি ছাড়া গোসল করতে পারে না। আমি বলেছিলাম আধা বালতি খরচ করতে।

আপনি আজ অফিসে যান নাই?

নাহ। ঘুম থেকেই উঠলাম সাড়ে এগারোটায়। নাস্তা টাস্তা কিছুই করি নাই। একবার ভাবলাম আপনার ভাইর সঙ্গে যাই, চারটা খেয়ে আসি।

গেলেন না কেন?

ভাতের কথা মনে উঠতেই বমি ভাব হলো, বুঝলেন।

কিছুই খান নাই?

পানি খেয়েছি দু'গ্লাস।

সোবাহান গা-ভর্তি ঘাম নিয়ে চৌকির ওপর বসে রইল। এ বাড়িতে পানির বড় কষ্ট। রাত আটটার আগে পানি পাওয়ার আজ আর আশা নাই।

সোবাহান সাহেব।

জি।

খাওয়াদাওয়া করবেন না?

নাহ।

সোবাহান সিগারেট ধরাল। ঘামে ভেজা শরীর। গুমোট গরম। জিভে জ্বালা ধরানো সিগারেট। কী কুৎসিত! কী কুৎসিত!

সোবাহান সাহেব।

বলেন।

আপনি যাওয়ার পরপরই আপনার বন্ধু এসেছিল। বুলু সাহেব। বেশিক্ষণ বসেনি।

বলেছে কিছু?

টাকা দিয়ে গেছে পাঁচটা। আপনার কাছ থেকে নাকি ধার নিয়েছিল। টেবিল ক্লথের নিচে রেখে দিয়েছি, দেখেন।

সোবাহান ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বুলু নিশ্চয়ই এই পাঁচ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে ছ'মাইল হেঁটে এসেছে। এবং হেঁটেই ফিরে গেছে। বাড়তি পয়সা খরচ করার মতো অবস্থা বুলুর না। বুলুর অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। সোবাহান হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, বড় ক্লান্তি লাগছে।

সোবাহানের বড়ভাই ফরিদ আলির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। লোকটির চেহারা ও চালচলন নির্বোধের মতো। নির্বোধ লোকদের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব থাকে। তারও আছে। সাগর রেস্টুরেন্ট এন্ড হোটেলের মালিক রশীদ মিয়ার সঙ্গে তাঁর খুব খাতির। তার জন্যে গতবার দু'টা আমগাছের কলম নিয়ে এসেছিলেন। এবারো কিছু এনেছেন নিশ্চয়ই। সোবাহান দেখল ঘরের এক কোনায় একটা পাকা কাঁঠাল, পলিথিনের ব্যাগ-এ ভর্তি কাঁচা আম। এইসব কার জন্যে এনেছেন কে জানে।

কাঁচা আম কার জন্যে?

আমাদের বাড়িওয়ালার জন্যে। তিনি নাকি গতবার কাঁচা আমের কথা বলে দিয়েছিলেন। কাশ্মিরি আচার হবে। আপনার বড়ভাই কিন্তু মাইডিয়ার লোক। খুব মাইডিয়ার।

জলিল সাহেব টেনে টেনে হাসতে শুরু করলেন। এর মধ্যে হাসির কী আছে কে জানে। বড়ভাইরা মাইডিয়ার হতে পারেন না?

কাঁঠালটা এনেছেন আমার জন্যে।

কাঁঠালের কথা বলেছিলেন নাকি?

না। কাঁঠাল আমি সহ্য করতে পারি না। কাঁঠাল হচ্ছে শিয়ালের খাদ্য। জ্যাকফুট। আপনার ভাই বললেন–এই কাঁঠালের নাম নাকি দুধসাগর। কাঁঠালের এরকম বাহারি নাম থাকে জানতাম না।

থাকে, অনেক রকম নাম থাকে। যা-ই থাকুক। কাঁঠাল কাঁঠালই, কী বলেন? কাঁঠাল তো আর আপেল না? সোবাহান কিছু বলল না। জলিল সাহেব বললেন, কি, খাওয়াদাওয়া করবেন না? নাহ। কোনো কাজ হয় নাই আজ? নাহ।

ভদ্রলোক কি স্ট্রেট নো বলে দিল? উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

চাকরি দেনেওয়ালারা হচ্ছে ভগবানের মতো। এদের সহজে দেখা পাওয়া যায় না। এরা প্রায় অদৃশ্য। হা হা হা।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সোবাহান শুয়ে পড়ল। ঘামে ভেজা গা। অসহনীয় গরম। তবু এর মধ্যেই সে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ঘুম নয়, ছোটখাটো একটা স্বপ্নও দেখল। একটা নদীর পারে সে বসে আছে। নদীতে একহাঁটু মাত্র পানি। ইচ্ছা করলেই পার হওয়া যায়। কিন্তু সে পার হতে পারছে না। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অন্যান্য অর্থহীন স্বপ্নের মতো একটা। অর্থহীন স্বপ্ন। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে সে জেগে উঠে দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জলিল সাহেব নেই। তার বড়ভাই ফরিদ আলি জায়নামাজ পেতে চোখ বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বসে। আছেন। তিনি মাথা ঘুরিয়ে বললেন, কিরে শরীর খারাপ?

না।

অসময়ে ঘুমাচ্ছিস?

সোবাহান গম্ভীর স্বরে বলল, দাড়ি রাখলেন কবে!

ফরিদ আলি মনে হলো লজ্জা পেলেন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ভাবি লিখেছিলেন আপনি ধর্ম নিয়ে মেতেছেন। দাড়ি রাখার কথা লেখেন নাই।

ধর্মকর্ম করা কি দোষের?

দাড়িতে আপনাকে মানায় না।

মানামানির তো কিছু নাই। দাড়ি তো আর গয়না না।

সোবাহান দেখল তার পোশাক-আশাকও বদলেছে। লম্বা একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। চোখে হয়তো সুরমাও আছে। কথাবার্তার ধরন ধারণও অন্যরকম। বেশ জোরের সঙ্গে কথা বলছেন। নামাজ শেষ করতে তার অনেক সময় লাগল। তারপরও দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে জায়নামাজের ওপর বসে রইলেন। পীর-ফকির হয়ে গেলেন নাকি? সোবাহান। বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। পীর ফকির হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু না। তাদের বংশে এটা আছে। তাঁর বাবা নিজেই একচল্লিশ বছর বয়সে কী একটা স্বপ্ন দেখে অন্যরকম হয়ে গেলেন। স্কুল মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে এক সন্ধ্যাবেলা ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশে যত মাজার আছে তার প্রতিটিতে এক রাত করে কাটাবেন। তার ওপর নাকি এরকম একটা নির্দেশ আছে। নির্দেশ কে দিয়েছেন কিছুই জানা গেল না, তবে এক সকালবেলা তিনি সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়লেন। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ নয়, গৃহী মানুষের গৃহত্যাগ। বহু লোকজন এল। রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার। সোবাহান তখন পড়ে ক্লাসে ফাইভে। তার বাবাকে নিয়েই এমন উত্তেজনা, এটা তাকে অভিভূত করে ফেলল। এবং আরও অনেকের সঙ্গে সেও এগারো মাইল হেঁটে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

তিনি ফিরে এলেন তিন সপ্তাহের মাথায়। দেখা গেল খালি হাতে আসেননি। সবার জন্যেই কিছু না কিছু এনেছেন। মার জন্যে টাঙ্গাইলের শাড়ি। (সে শাড়ি মার পছন্দ হয়নি। জমিন মোটা)। সোবাহানের জন্যে একটা পিস্তল যা টিপতেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হয় এবং নল দিয়ে খানিকটা ধোয়া বের হয়। ফরিদ আলির জন্যে বার্মিজ লুঙ্গি। রীতিমতো একটি উৎসব। সেবার তিনি প্রায় মাসখানিক থাকলেন। তারপর আবার। গেলেন। আর ফেরার নাম নেই। সংসারে নানান অশান্তি। ফরিদ আলি আইএ ফেল করেছে। শুধু তাই নয়, যে বাড়িতে জায়গির থেকে পড়ত সে বাড়ির একজন বিধবা। মহিলার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মহিলাটি তার মায়ের বয়েসী। গল্প-উপন্যাসের জেদি প্রেমিকদের মতো একদিন সে ঘুমের

ওষুধও খেয়ে ফেলল। বিশ্রী অবস্থা। হাসপাতালে দিন সাতেক কাটানোর পর তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো এবং বারো বছরের একটি কিশোরীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। মেয়েটির নাম ময়না।

সোবাহানের বাবা ছেলের বিয়ের পরদিন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে চেনার উপায় নেই। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে টপ টপ করে সেখান থেকে উকুন পড়ে। সেসব উকুনের সাইজও প্রকাণ্ড। উকুন মারার ব্যাপারে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। ঠিক কতগুলি উকুন মারা পড়েছে তার। হিসাব রাখতে লাগলেন। যেমন একদিন সর্বমোট সাতাত্তরটি উকুন মারা পড়ে। এটিই সবচেয়ে বড় রেকর্ড। তিনি এই খবরটি হাসিমুখে অনেককেই দিলেন, যেন এটা তাঁর। বিরাট একটা সাফল্য।

বড় ছেলের বিয়ের ব্যাপারেও তিনি দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকেন। মেয়েটি যে অত্যন্ত সুলক্ষণা এই কথা অসংখ্যবার বলতে লাগলেন। তিনি নাকি ইস্তেখারা করে এই বিয়ের কথা জানতে পেরেই ছুটে এসেছেন। তাঁকে সময় অসময়ে বালিকা পুত্রবধূটির সঙ্গে গল্পগুজব করতে দেখা গেল। প্রায় বছর খানিক তিনি থাকলেন, তারপর আবার গেলেন এবং তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ফরিদ আলি আইএ পাশ করলেন। বিএ ক্লাসে ভর্তি হলেন এবং বিএ পরীক্ষায় যথাসময়ে ফেল করলেন। সোবাহান আইএ পাশ করল। ঢাকা শহরে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। কলেজে ভর্তি হয়ে তেমন কোনো পড়াশোনা ছাড়াই একসময় বিএ পাস করে ফেলল।

সোবাহান।

জি।

বারান্দায় বসে আছিস কেন? ভেতরে আয়।

সোবাহান নড়ল না। বেশ বাতাস দিচ্ছে। ভালোই লাগছে বসে থাকতে। ফরিদ আলি আবার ডাকলেন, আয়, ভেতরে আয়, কথা বলি।

সোবাহান ভেতরে এসে ঢুকল।

খালি গায়ে বারান্দায় বসাটা ঠিক না। মেয়েছেলে আছে।

সোবাহান কিছু বলল না। ভেতরে চলে এল।

কী বলবেন।

তোদের বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে রাতে খেতে বলেছেন।

সোবাহান ভ্রূ কুঁচকাল।

খেতে বলল কেন?

অসুবিধা কী? আদর করে বলেছে।

যান, খেয়ে আসেন। তার জন্যে কাঁচা আম এনেছেন দেখলাম।

আমের কথা বলেছিলেন গতবার।

বলেছিল বলেই ঘাড়ে করে এক বস্তা আম নিয়ে আসবেন?

ঘাড়ে করে আনব কেন? তুই এরকম করছিস কেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে খাতির নাই?

বাড়িওয়ালার সাথে বাড়তি খাতির কিসের?

এটা ঠিক না। সবার সাথে মিল মহব্বত থাকা দরকার।

সোবাহান চুপ করে গেল। কথা বলতে আর ভালো লাগছে না।

তোর ভাবি যেতে বলেছে। অনেকদিন দেশে যাস না।

যাব।

আমার সঙ্গে চল। আমি কাল সকালে রওনা হব।

না। এখন যাওয়া যাবে না।

অসুবিধা কী?

একটা চাকরির ব্যাপারে খোঁজখবর করছি।

তোর ভাবি বলল চাকরি-বাকরি না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে।

টাকা আসবে কোত্থেকে?

উত্তর বন্দের জমিটা বিক্রি করে দেব। এখন জমির খুব দাম।

জমি বিক্রি করার দরকার নাই।

ফরিদ আলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর নিচুগলায় বললেন–জমিটা এমনিতেই বিক্রি করতে হবে। আমার নিজের কিছু টাকা দরকার। বিশেষ দরকার।

কেন?

একটা নামাজঘর। ধর্মীয় বইপুস্তক থাকবে। ঘরটা পাকা করার ইচ্ছা।

ও।

এইজন্যেই এলাম। তোর মত ছাড়া তো জমি বিক্রি হবে না। কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। সই করে দিস। রেজিস্ট্রেশনের সময় তোর যাওয়ার দরকার হবে।

কতটা জমি?

ফরিদ আলি তার উত্তর দিলেন না। এরকম ভাব করলেন যেন শুনতে পাননি। তিনি বদলে যাচ্ছেন। কথাবার্তা যা বলার স্পষ্টভাবে বলছেন। ভাষাটাও শহুরে। তার মানে ইদানীং

প্রচুর কথা বলছেন। নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। সোবাহান বলল, আপনার কাছে এখন লোকজন আসে বোধহয়। আসে না?

আসে কেউ কেউ।

কী জন্যে আসে?

ধর্মের কথা শুনতে চায়। পরকালের কথা শুনতে চায়।

পরকালের কথা আপনি জানেন?

যা জানি তা-ই বলি।

সারা দিন কি ধর্মকর্ম করেন?

আরে না। আমি সংসারী মানুষ। এত সময় কই?

ভাব ভঙ্গি তো সেরকম দেখি না।

ফরিদ আলি প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করলেন। হালকা গলায় বললেন, তোর এখানে বড় গরম।

হুঁ।

নীলগঞ্জেও গরম, তবে সন্ধ্যার পর আমগাছটার নিচে বসি। বেশ বাতাস। ভালোই লাগে।

লোকজনদের বাণী-টাণী যা দেন সব আমগাছের নিচে বসেই দেন?

ফরিদ আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

.

০৪.

মনসুর সাহেবকে বাড়িওয়ালা বলা ঠিক না, কারণ তিনি বাড়িওয়ালা নন। বাড়ি সরকারের। মনসুর সাহেব ফুড ইন্সপেক্টর হিসেবে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কীভাবে যেন পেয়ে গেছেন। ইদানীং তিনি এ বাড়িটিকে নিজের বাড়ির মতো দেখেন। সরকার এইসব। বাড়ি নাকি এলটিদের মধ্যে বিক্রি করবেন এরকম গুজব শোনা যাচ্ছে। তবে যাদের দেওয়া হবে তাদের শহীদ পরিবার কিংবা মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে। মনসুর সাহেব এর কোনোদলেই পড়েন না, তবু তিনি বহু হাঙ্গামা করে কিছু সার্টিফিকেট যোগাড় করেছেন। যার ভাবার্থ হচ্ছে–তার বাড়িটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকার একটি আদর্শ স্থান। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে তাঁর ঘরে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখতেন। এ করতে গিয়ে মে মাসে তিনি গ্রেফতার হন এবং আট দিন সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হন। তার বা পা-টি প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

এসব সার্টিফিকেটের কপি তিনি সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন। সেক্রেটারিয়েটে তাঁর ধরাধরির কোনো লোক নেই। এ জন্যে কাগজপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নড়াতে

তার প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে। অর্থ ব্যয়ও হচ্ছে। মাসে দুতিন দিন তিনি সেক্রেটারিয়েটে সারা দিন কাটান। এক অফিস থেকে অন্য অফিসে যাওয়ার সময় পা টেনে টেনে হাঁটেন।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আজকাল সত্যি সত্যি বাঁ পায়ে তিনি জোর পান না। পা-টা যেন অচল হয়ে পড়ছে। তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা–বাড়িটার বন্দোবস্ত নেওয়া। একতলা বাড়ি। দোতলায় দুটি ঘর তোলা শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি। তিনি ইচ্ছা করলে শেষ করে ভাড়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাহসে কুলায় না। ভাড়াটেরা একটা ঝামেলা করতে পারে। হয়তো দেখা যাবে ভাড়াটেরা একটা শহীদ পরিবার। তারা। সরকারের কাছ থেকে এলটমেন্ট জোগাড় করে ফেলবে–তিন ঝামেলা।

বাইরের একটা ঘর তিনি জলিল সাহেবকে ভাড়া দিয়েছেন। চেনা লোক। সে আবার আরেকজনকে নিয়ে এসেছে। মাসের শেষে দেড়শ টাকা আসছে। এমন কিছু বড় এমাউন্ট না, কিন্তু দুটি পুরুষমানুষ থাকলে মনের মধ্যে সাহস থাকে। পরিত্যক্ত বাড়িগুলির নানা ফ্যাকড়া। হুটহাট করে পার্টি বের হয়ে পড়ে, যারা দাবি করে এই বাড়ি তাদের কেনা। দখল নিতে আসে। তবে এ বাড়ি নিয়ে এখনো তেমন কিছু হয়নি। সবকিছু খুব সহজভাবে এগুচ্ছে। তবু একটা অশান্তি থাকেই। সবসময় ভয় হয় শেষ। পর্যন্ত একটা কিছু ঝামেলা লেগে যাবে।

মনসুর সাহেব আছেন?

আসেন ভাই, আসেন।

তিনি হাসিমুখে দরজা খুলে দিলেন–আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

ফরিদ আলি ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ ঘরে শাড়ি পরা একটা অল্পবয়স্কা মেয়ে বসে আছে।

ও হচ্ছে যূথি। আমার শ্যালিকা। যূথি, সালাম করো।

যুঁথি স্লামালিকুম বলে ব্রিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। জব্বার সাহেব বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন, পা ছুঁয়ে সালাম করো। এইসব শিখিয়ে দিতে হয়?

মেয়েটি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফরিদ আলি গম্ভীর গলায় বললেন, না না, সালাম করতে হবে না। পা ছুঁয়ে সালাম করা ঠিক না। এতে মাথা নিচু করতে হয়। আমরা মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথা নিচু করি না। (যূথি তাকিয়ে রইল। মেয়েটা সুন্দর, তবে বড় রোগা। দেখলেই মনে হয় অসুস্থ। ফরিদ আলি বললেন, তুমি কী পড়? জবাব দিলেন মনসুর সাহেব, মেট্রিক পাস করে। বসে আছে। থার্ড ডিভিশনে পাস করেছিল। কলেজে ভর্তি করতে পারি নাই। সেকেন্ড ডিভিশন ছাড়া কোনো কলেজে নেয় না। বিয়ে দিয়ে দিব, ছেলে খুঁজছি। আমার শ্বশুর শাশুড়ি নাই, আমিই গার্জিয়ান। যূথি, যাও, খাবারটাবার দিতে বলো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

মনসুর সাহেব অকারণে রেগে গেলেন। ফরিদ আলি বললেন, আপনার বাড়ি খুব সুন্দর। ভেতরে অনেক জায়গা মনে হয়।

তা জায়গা আছে। তবে বাড়ি এখনো আমার হয় নাই। চেষ্টা করছি কেনার। হাজার রকমের ফ্যাকড়া।

তাই নাকি?

আর বলেন কেন? আপনারা সুফি মানুষ, দুনিয়ার হালচাল তো জানেন না।

মনসুর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে পরিত্যক্ত বাড়ি সম্পর্কে বলতে লাগলেন। ফরিদ আলি তাকিয়ে রইলেন আগ্রহ নিয়ে।

সেক্রেটারিয়েটের চেয়ার টেবিলগুলি পর্যন্ত টাকা খায়।

এইসব কেয়ামতের নিশানা। কেয়ামতের আগে আগে পৃথিবী থেকে আল্লাহপাক সমস্ত সৎ মানুষ তুলে নিবেন। মা তার ছেলেকে বিশ্বাস করবে না। স্ত্রী বিশ্বাস করবে না স্বামীকে!

মনসুর সাহেব ধর্মীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তাকিয়ে রইলেন ভাবলেশহীন চোখে। খাবারদাবার যূথি নিয়ে এল। ঘরে কোনো কাজের লোক নেই। যূথিকেই বারবার আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। ডালের বাটি আনার সময় খানিকটা ডাল ছলকে পড়ল। মনসুর সাহেব ধমকে উঠলেন, দেখেশুনে হাঁটো! অন্ধ নাকি? একটা কাজও ঠিকমতো হয় না।

ফরিদ আলি বললেন, আপনার স্ত্রী কোথায়?

ও অসুস্থ, শুয়ে আছে।

অসুখবিসুখের মধ্যে ঝামেলা করলেন কেন?

অসুখবিসুখ লেগেই আছে, ওটা বাদ দেন।

একটিই শালী আপনার?

জি-না! তিনজন। দু'জনকে বিয়ে দিয়েছি। এইটি বাকি। শালী পার করতে গিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে বুঝলেন?

ফরিদ আলি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে পাশেই। এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছে।

দেখেন না ভাই, একটা ছেলে জোগাড় করতে পারেন কিনা। কিছু খরচপাতি করব। উপায় কী বলেন?

ফরিদ আলি তাকালেন মেয়েটির দিকে। এ জাতীয় কথাবার্তা শুনে বোধহয় তার। অভ্যাস আছে। সে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মেয়েটা সুন্দর তবে রোগা, বেশ রোগা। মনসুর সাহেব ক্লান্তগলায় বললেন, একটু দেখবেন। আমার খুব উপকার হয়।

জি, আমি দেখব।

ছেলে ভালো হলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। ভদ্র ফ্যামিলির ভদ্র ছেলে। ব্যস, আর কোনো ডিমান্ড নাই।

আমি দেখব।

ফরিদ আলি আবার তাকালেন মেয়েটির দিকে। বাচ্চা মেয়ে। মিষ্টি চেহারা। বড় মায়া লাগে। ফরিদ আলি ভাত মাখাতে মাখাতে বললেন, আমার ছোটভাইকে কি আপনার পছন্দ হয়? ও বিএ পাশ করেছে। চাকরিবাকরি অবশ্যি এখনো কিছু পায় নাই। বলেই তিনি তাকালেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

পছন্দ হলে আমাকে বলবেন। কালকের মধ্যে বলবেন। আমি পরশু দিন সকালে চলে যাব।

সে বিয়ে করতে রাজি হবে?

আমি বললে হবে।

ফরিদ আলি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েটি তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

খুব ভালো খেলাম ভাই। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মনসুর সাহেব ধমকে উঠলেন–যূথি, হাত ধোয়ার পানি দাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

যূথি যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি রইল, নড়ল না। এই প্রথম বোধহয় তার দুলাভাইয়ের কথার অবাধ্য হলো। ভেতরে থেকে মেয়েলি গলায় ডাকল, যূথি, ও যূথি।

যূথি নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল। ফরিদ আলি বললেন, আপনার স্ত্রীর কী অসুখ?

মনসুর সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালেন।

মাথা খারাপ। মাথার দোষ।

তাই বুঝি?

জি। খুব অশান্তিতে আছি।

কথাটা বলেই মনসুর সাহেবের মনে হলো এটা ঠিক হলো না। তিনি শুকনো গলায় বললেন, তবে ভাই বংশগত নয়। টাইফয়েডের পর এরকম হয়েছে। তাদের বংশে পাগল নাই।

অসুখবিসুখের ওপর মানুষের হাত নাই।

পান খাবেন ফরিদ সাহেব?

জি-না, আমি পান-তামাক কিছু খাই না।

সুফি মানুষ আপনারা।

মনসুর সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল। বড় বিরক্তিকর ব্যাপার। মনসুর সাহেব গলাখাঁকারি দিলেন।

কোনো লাভ হলো না। কান্নার শব্দ বাড়তে লাগল। ফরিদ আলি বসে আছেন চুপচাপ। যেন তাঁর উঠবার কোনো তাড়া নেই। বসে থাকবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সহজে উঠবেন না।

ফরিদ সাহেব!

জি।

রাত কত হয়েছে?

জানি না, আমার কাছে ঘড়ি নাই।

মনসুর সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালেন। এই লোক সহজ ইংগিতও ধরতে পারছে। খাল কেটে কুমির আনা একেই বলে। দিব্যি পা উঠিয়ে চেয়ারে বসে আছে। অবিবেচক মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে এত বেশি কেন? মনসুর সাহেব কর্কশ গলায় বললেন, যূথি, পান দিতে হবে না? ফরিদ আলি বললেন, পান আমি খাই না।

আপনার জন্যে না। আমার নিজের জন্যে।

ও আচ্ছা।

ফরিদ আলি আবার নিঃশব্দ হয়ে গেলেন। তিনি কি আজ সারা রাতই এভাবে বসে কাটাবেন?

.

যুঁথি ঘুমোতে যায় অনেক রাতে। এ বাড়িতে কোনো কাজের লোক নাই। রান্নাঘর গুছিয়ে উঠতেই অনেক সময় লাগে। সে দ্রুত কিছু করতে পারে না। তার ওপর তার পরিষ্কারের বাতিক আছে। সবসময় মনে হয় ঠিকমতো ধোয়া হলো না বুঝি। প্লেটের কোথাও বুঝি সাবানের ফেনা লেগে আছে।

আজও সব কাজ সারতে সারতে রাত একটা বেজে গেল। যূথি ঘুমোতে যাওয়ার আগে একবার খোঁজ নিতে গেল মনসুর সাহেবের কিছু লাগবে কিনা। মনসুর সাহেবের অনিদ্রা রোগ আছে। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জাগেন। আজও জেগে ছিলেন। যূথিকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

দুলাভাই, কিছু লাগবে?

না, কিছু লাগবে না। ঘুমাও নাই এখনো?

যূথি সরু চোখে তাকিয়ে রইল। মনসুর সাহেবের গলার স্বর অনেকখানি নেমে এসেছে। যূথি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মাঝে মাঝে মনসুর সাহেব এরকম নরম স্বর বের করেন। সেটা হয় মধ্যরাতের দিকে।

যূথি!

জি।

তোমার আপা ঘুমাচ্ছে নাকি?

জি।

আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল, বুঝলে যূথি। সংসার করা কাকে বলে জানলামই না।

যুঁথি উঠে দাঁড়াল। মনসুর সাহেব বললেন, বসো না আরেকটু।

যুঁথি দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে সে বুঝতে পারছে না। দুলাভাই অন্যরকমভাবে তাকাচ্ছেন।

রাত হয়ে গেছে। আমি যাই দুলাভাই।

যুঁথি ঘুমায় তার বড় বোন কদমের সঙ্গে। মনসুর সাহেব তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমান না। সোজাসুজিই বলেন–মাথার ঠিক নাই তার, কোন সময় কী করবে ঠিক আছে? হয়তো ঘুমের মধ্যেই চোখ গেলে দিবে। তখন?

তার ভয়টা অমূলক। কদমের অসুস্থতা সে পর্যায়ের নয়। সে প্রায় সময়ই কাঁদে। এবং বাকি সময়টা সিডেটিভের কল্যাণে ঘুমায়। যূথি এসে ডাকল–আপা, ঘুমিয়েছ?

না।

ক্ষিধে লেগেছে? কিছু খাবে?

না।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেব আপা?

দে।

যুঁথি বাতি নিভিয়ে কদমের পাশে এসে বসল। চুল টেনে টেনে দিতে লাগল। কদম বলল, দাড়িওয়ালা লোকটা কে? কী জন্যে এসেছিল?

দাওয়াত খেতে এসেছিল।

দাওয়াত খেতে এল কেন?

যুঁথি জবাব দিল না। কদমও জবাবের অপেক্ষা করল না। ঘুমিয়েও পড়ল না। যূথির ঘুম আসছিল না। সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। বারান্দায় দুলাভাই হাঁটাহাঁটি করছেন। তিনি একবার দরজার পাশে এসে ডাকলেন–বৃথি, বৃথি। যূথি জবাব দিল না। বেশ গরম, তবু সে একটা কাঁথা পর্যন্ত টেনে দিল। তার মনে হলো সেও বোধহয় আপার মতো একসময় পাগল হয়ে যাবে। এটা তার প্রায়ই মনে হয়।

.

০৫.

সোবাহান ঘুমিয়ে ছিল। বুলু এসে তাকে ডেকে তুলল–কিরে, অবেলায় ঘুমাচ্ছিস কেন?

সোবাহান কিছু বলল না। বুলু বলল, ওইদিন সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলি?

চাকরির ব্যাপারে।

কী রকম বুঝলি, আশা আছে?

হুঁ।

বুলুর মুখ উজ্জ্বল হলো মুহূর্তেই। হাসিমুখে বলল, তোরটা হলেই আমারটা হবে। রাশির একটা ব্যাপার আছে। আমাদের দুজনের সবকিছু একসঙ্গে হয়। ঠিক না?

সোবাহান জবাব দিল না। বুলু বলল, এরকম গম্ভীর হয় আছিস কেন? শরীর খারাপ?

না, শরীর ঠিকই আছে।

অবেলায় ঘুমোচ্ছিলি কেন?

এ ছাড়া করবটা কী?

সোবাহান কাপড় পরতে শুরু করল। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। বুলু বিস্মিত হয়ে বলল, বেরুচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

চা খেতে। ওই মোড়ের দোকানে চা খাব। মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। চল যাই।

চা খাব নারে। ভাত খাব। ক্ষিধে লেগেছে।

সোবাহান কিছু বলল না। বুলু বলল, খাওয়া হয় নাই। মামার সঙ্গে একটা ফাইটিং হয়ে গেল।

তাই নাকি?

হুঁ। চোর টোর বলল। মামিকে বলে গেছে–আমাকে ভাত দিলে তিন তালাক হয়ে যাবে। চিন্তা কর অবস্থা!

বলিস কী?

কেলেংকারি কাণ্ড। মামি কাঁদছে। বাচ্চাগুলি কাঁদছে।

বাচ্চারা কাঁদছে কেন?

সবচেয়ে ছোটটাকে মামা একটা কিক বসিয়ে দিয়েছে। রাগলে তার মাথা ঠিক থাকে না। মহা ছোটলোক। একদিন শুনবি শালাকে আমি খুন করে ফেলেছি।

বুলু তিন প্লেট ভাত খেয়ে ফেলল। সোবাহান বলল, আর কিছু খাবি? দৈ মিষ্টি?

বুলু মাথা নাড়ল।

খা, অসুবিধা কিছু নাই। এখন টাকা দিতে হবে না।

না, আর কিছু না। সিগারেট দে। আছে?

আছে।

বুলু চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগল। বুলুর চেহারাটা চমৎকার। ফর্সা গায়ের রঙ। মেয়েদের মতো চিবুক। বড় বড় চোখ। তাকে দেখলেই মনে হয় সিনেমার কোনো নায়ক বেকার যুবকের ভূমিকায় পার্ট করছে।

বুঝলি সোবাহান, মামির জন্যে টিকে আছি। মামির দিকে তাকিয়েই ওই শালাকে খুন করতে পারছি না।

তুই এখন কী করবি?

কিছু করব না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরব। এর মধ্যে মামা কিছুটা ঠান্ডা হবে আশা করা যায়।

সন্ধ্যা হতে তো দেরি আছে।

এতক্ষণ কী করবি? আমার সঙ্গে চল।

না, তোর ওখানে যাব না। ঘরটা ভালো না। ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। আসি। আমি কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব।

টাকাপয়সা আছে তোর কাছে?

না।

দশটা টাকা নে আমার কাছ থেকে।

আরে না, টাকা থাকলেই খরচ হয়ে যাবে। তুই বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দে। আমার একটা বাকির দোকান ছিল। ব্যাটার ভগ্নিপতি মারা গেছে। দোকান বন্ধ করে গেছে দেশে।

বুলু উঠে দাঁড়াল। সোবাহান তাকে এগিয়ে দিতে গেল। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত তারা হাঁটল নিঃশব্দে। বুলুর মুখে গাঢ় দুশ্চিন্তার রেখা। হাঁটছে মাথা নিচু করে। সোবাহান বলল, আমার সঙ্গে এসে কিছুদিন থাকতে পারিস। থাকবি?

আরে না।

আমার সঙ্গে দেশে যাবি? কয়েকদিন থেকে আসব।

বুলু জবাব দিল না।

জায়গাটা ভালো। তোর পছন্দ হবে।

বুলু সিগারেট ধরাল। তার সম্ভবত কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

০৬-১০. রহমান সাহেব আজ অফিসে

রহমান সাহেব আজ অফিসে এসেছেন। তার পিএ বলে দিয়েছে এগারোটায় একটা বোর্ড মিটিং আছে, মিটিংয়ের আগে বড় সাহেব কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। সোবাহান জিজ্ঞেস করল, বোর্ড মিটিং শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?

পিএটি বিরক্ত মুখে বলল, তা কী করে বলব? কী কী এজেন্ডা আছে তার ওপর ডিপেন্ড করে। লাঞ্চ টাইমের আগেই শেষ হবে। লাঞ্চের পরে আসেন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

সোবাহান তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এই মেয়েটির কথাবার্তায় অপমান করার চেষ্টা আছে। অথচ কেমন ভদ্র, বড় বোন বড় বোন চেহারা!

এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কাজের ক্ষতি হয়। ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন।

একটা স্লিপ কি দয়া করে পাঠাবেন? আমার সঙ্গে তার আগে কথা হয়েছে। উনি আমাকে চিনেন।

চিনলেও কোনো কাজ হবে না। বোর্ড মিটিংয়ের আগে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি নিচে গিয়ে বসুন। এক কথা কবার বলব!

সোবাহান নিচে নেমে এল। রিসিপশনের মেয়েটি আজ একটা আগুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে। তাকে চেনাই যাচ্ছে না। মেয়েদের সৌন্দর্যের বেশির ভাগই বোধহয় তাদের

শাড়ি গয়নায়। সোবাহান এগিয়ে এসে পরিচিত ভঙিতে হাসল। মেয়েটি তাকাল অবাক হয়ে। সোবাহানকে কি চিনতে পারছে না? গতকালই তো অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। মেয়েটি বলল, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?

জি-না। আমি রহমান সাহেবের কাছে এসেছি।

উনি খুব সম্ভব বোর্ড মিটিং-এ আছেন। উনার পিএ বসেন দোতলায়। রুম নম্বর ৩০২।

উনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ও আচ্ছা।

মেয়েটি একটি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সোবাহানকে সত্যি সত্যি চিনতে পারছে না? অপমানিত হওয়ার মতো ব্যাপার। সোবাহানের কান ঝা ঝা করতে লাগল।

আমি গতকাল এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন আজ আসতে।

আমার মনে আছে। আপনি থাকেন শ্যামলীতে। বসুন ওখানে।

সোবাহান বসে রইল।

রহমান সাহেব একটার সময় লাঞ্চ খেতে গিয়ে আর ফিরলেন না। পিএটির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তবু তিনটার দিকে সোবাহান গেল তার কাছে। মেয়েটি শুকনো গলায় বলল, দুটোর দিকে তো চলে গেছেন।

আজ আসবেন কি আসবেন না বলে যাননি?

আমাকে বলে যাবেন কেন? আমি কি এখানকার হেড মিসট্রেস? উনি কখন আসবেন না আসবেন সেটা তার ব্যাপার।

এমন ভদ্র চেহারা মেয়েটির। শালীন পোশাকআশাক, অথচ কথাবার্তা বলছে। ছোটলোকের মতো। সোবাহান কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে বসল, ভদ্রভাবে বলেন।

ভদ্রভাবে কথা বলব মানে?

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। সোবাহান শান্তস্বরে বলল, আপনার কথাবার্তা রাস্তার মেয়েদের মতো।

তার মানে? তার মানে?

মেয়েটি রাগে কাঁপছে। তার পাশের টেবিলের বুড়ো মতো ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন, সবুর মিয়া, সবুর মিয়া।

সবুর মিয়া ঢুকল না। সোবাহান ভারী গলায় বলল, ভবিষ্যতে আর এরকম ব্যবহার করবেন না।

আপনি কি আমাকে মারবেন নাকি?

নাহ। মেয়েদের গায়ে আমি হাত তুলি না। ছেলে হলে এক চড়ে মাঢ়ির দুটো দাঁত নড়িয়ে দিতাম।

মেয়েটির গাল গোলাপি বর্ণ ধারণ করল। সোবাহান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিচে গেল। তার ভয় করছিল হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন এসে তাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। শুধু বুড়োটি পিছু পিছু নেমে এল। সে তাকাচ্ছে ভয় পাওয়া চোখে। তাকে কি গুণ্ডাদের মতো লাগছে?

রিসিপশনের মেয়েটি টেলিফোনে খুব হাসছে। সকালবেলা তাকে যতটা রূপসী মনে হচ্ছিল এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না। সোবাহান তার দিকে তাকিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে হাসল। মেয়েটি টেলিফোনে কথা বলা বন্ধ রেখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন সে বিস্মিত। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কী আছে? একজন মানুষ কি আরেকজন মানুষের দিকে তাকিয়ে হাসবে না!

সোবাহান সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরল। আজও দুপুরে তার খাওয়া হলো না। বৈশাখ মাসের অসম্ভব কড়া রোদ। ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। প্রেসক্লাবের কাছে কাটা তরমুজ বিক্রি হচ্ছে। এক টাকা করে পিস। খেলে হয় একটা।

কিনতে গিয়েও কিনল না। মাঝে মাঝে নিজেকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয়। কড়া রোদেই সে আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

.

ফরিদ আলি বললেন, সোবাহান কি রোজ রোজই এমন দেরি করে? জলিল সাহেব দাঁত বের করে হাসলেন, তা করে। যুবক মানুষ।

যুবক মানুষ হলেই দেরি করে ফিরতে হবে এটা কী কথা?

এসে পড়বে। চিন্তা করবেন না।

এক্সিডেন্ট হয় নাই তো?

আরে এরা চালু ছেলে, এরা এক্সিডেন্ট করবে কী?

চাল্লু ছেলে? চাল্লু ছেলে বললেন কেন?

ফরিদ আলি গম্ভীর হয়ে গেলেন। জলিল সাহেব বললেন, রাতও তো বেশি হয় নাই। দশটা বাজে।

দশটা কম রাত?

এ আপনাদের নীলগঞ্জ না। এটা ঢাকা শহর। এখানে সন্ধ্যা হয় এগারোটায়। নেন ভাই সিগারেট ধরান, নার্ভ ঠান্ডা হবে।

আমি সিগারেট খাই না।

বাচ্চা ছেলে তো না যে এতটা অস্থির হয়েছেন। অস্থির হওয়ার কিছুই নাই।

ফরিদ আলি রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি হবে বোধহয়।

সোবাহান এল রাত এগারোটায়। ফরিদ আলি ভয় পাওয়া গলায় বললেন, কী ব্যাপার, এত দেরি?

সোবাহান জবাব দিল না। তাকাল না পর্যন্ত।

আমি তো চিন্তায় অস্থির।

চিন্তার কী আছে?

চিন্তার কী আছে মানে? তোকে বলেছিলাম না রাতের ট্রেনে চলে যাব। ছিলি কোথায় তুই?

সন্ধ্যাবেলা একটা পার্কে গিয়েছিলাম। কেমন করে যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। টায়ার্ড হয়ে ছিলাম।

কোথায় ঘুমালি?

ওইখানে বেঞ্চি আছে। বেঞ্চিতে।

খাওয়াদাওয়া করেছিস?

হুঁ। আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ। জলিল সাহেবের সঙ্গে খেয়ে এলাম।

ফরিদ আলি সোবাহানের হাত ধরলেন। মৃদুস্বরে বললেন, চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

নীলগঞ্জে। কয়েকদিন থেকে আসবি। তোর ভাবি খুব করে যেতে বলেছে।

একটা কিছু হোক, তারপর যাব।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করছে। দেখতে দেখতে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। সোবাহান যে গতিতে হাঁটছিল তার কোনো পরিবর্তন হলো না। ফরিদ আলি তার হাত ধরেই থাকল। দু'জনে ঘরে ঢুকল কাকভেজা হয়ে। ফরিদ আলির মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। সোবাহানের ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারছেন না।

তারা ঘুমোতে গেল অনেক রাতে। চৌকিটি ছোট–দু'জনের জায়গা হয় না। ঘেঁসাঘেঁসি করে ঘুমোতে হয়। গত রাতে খুব কষ্ট গেছে। আজ আরাম করে ঘুমানো যাবে। শীতল হাওয়া। ফরিদ আলি বললেন, কাঁথা টাথা কিছু আছে নাকি রে? শীত শীত লাগছে।

বিছানার চাঁদরটা গায়ে দেন। কাঁথা নাই। একটা লেপ আছে শুধু। লেপ দিব?

না। এর পরেরবার আসার সময় কাঁথা নিয়ে আসব।

সোবাহান কিছু বলল না। ফরিদ আলি বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

না।

মনসুর সাহেবের শালীকে দেখেছিস? যূথি? যূথি নাম।

দেখেছি।

মেয়েটি কেমন?

যক্ষ্মারোগী। আর কেমন। কেন?

ফরিদ আলি চুপ করে গেলেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। ভালোই লাগছে। সোবাহান বলল, ওই মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করেন কেন?

মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ভালো মেয়ে। একটু রোগা এই যা। বিয়ের পর গায়ে গোশত লেগে যাবে। মনে সুখ থাকলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। কত দেখলাম। তোর

ভাবিও তো রোগা ছিল। ছিল না?

এতসব বলছেন কেন?

তুই মেয়েটাকে বিয়ে কর। রোজগারপাতির কথা চিন্তা করিস না। আল্লাহপাক রুজি রোজগারের মালিক।

আপনি কি বিয়ের কথাবার্তা বলেছেন?

হুঁ। পাকা কথা দেই নাই। তোকে না জিজ্ঞেস করে দেই কীভাবে! ওদের তোকে পছন্দ হয়েছে।

সোবাহান চুপ করে রইল।

একটা মানুষ ভালো কি মন্দ সেটা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভালো মানুষের চেহারায় নূরানী থাকে।

মেয়েটার চেহারায় নূরানী দেখলেন?

হুঁ। যাস কই?

একটু বারান্দায় গিয়ে বসি।

এখন আবার বারান্দায় বসাবসি কী? একটা বাজে।

ঘুম আসছে না।

সোবাহান বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ছে সমানে। বৈশাখ মাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হয় না। ঝমঝম করে খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে সব শেষ। মুহূর্তে

আকাশে তারা ওঠে। আজ বোধহয় সারা রাতই বৃষ্টি হবে। সমস্ত রাত আকাশ থাকবে মেঘলা।

কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাকি মনের ভুল? সোবাহান ভালো করে শুনতে চেষ্টা করল। বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ যে কাঁদছে এতে সন্দেহ নেই।

সোবাহান!

সোবাহান তাকিয়ে দেখল ফরিদ আলি উঠে আসছেন। সে তার সিগারেট উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল।

সোবাহান!

জি।

কাঁদছে কে?

মনসুর সাহেবের শালী বোধহয়। প্রায়ই কাঁদে।

কেন?

কী জানি কেন।

ফরিদ আলি বড়ই অবাক হলেন। একজন মানুষ শুধু শুধু কাঁদবে কেন?

.

০৭.

নীলগঞ্জ থেকে ভাবির চিঠি এসেছে।

চিঠি পড়ে বুঝবার উপায় নেই মহিলাটির পড়াশোনা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। সুন্দর হাতের লেখা। বানান ভুল প্রায় নেই। ভাষাটাও বেশ ঝরঝরে। দুপুরবেলা শরৎচন্দ্র পড়ে পড়ে তার এই উন্নতি। 'দেবদাস' ভাবি সম্ভবত মুখস্থ বলে যেতে পারেন। দেবদাস' তিনি এগারোবার পড়েছেন।

সোবাহান ভাবির দীর্ঘ চিঠিটা দু'বার পড়ল।

প্রিয় ভাই,

দোয়া নিয়ো।

বড় খবর হইল তোমার ভাই উত্তর বন্দের জমি বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। বিক্রয়ের পর আমি জানিতে পারি। আমার দুঃখ এই

তুমি শিক্ষিত ছেলে হইয়াও জমি বিক্রয়ের বিষয়ে নীরব থাকিলে। আমার সঙ্গে তোমার ভাই কোনো পরামর্শ করে নাই। কারণ মেয়েদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ তিনি করেন না। মেয়েদের পরামর্শে সংসার চলিলে নাকি সংসারে আয় উন্নতি হয় না।

জমি বিক্রয়ের টাকায় নামাজঘর তৈরি হইতেছে। নামাজঘর হইল একটা পাকা কোঠা। সেখানে তোমার ভাই এবাদত বন্দেগি করিবেন। এবাদতের জন্যে পাকা ঘর লাগে তাহা জানিতাম না। আমরা মেয়েমানুষেরা অনেক কিছু জানি না।

সংসারে নানান ঝামেলা। পরামর্শ করিবার কেহ নাই। তুমি আসিলে ভালো হইত। শুনলাম তোমার শরীরও নাকি খুব খারাপ হইয়াছে। হোটেলে খাওয়া–শরীর নষ্ট হইবে জানা কথা। তুমি ভাই কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার ভাইয়ের নামাজঘর দেখিয়া যাও। আল্লাহ তোমাকে সুখে শান্তিতে রাখুক।

তোমার ভাবি

সোবাহান লক্ষ করল চিঠিতে যূথির কথা নেই। তার মানে ভাইসাহেব এই প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। অদ্ভুত লোক!

কার চিঠি এত মন দিয়ে পড়ছেন?

ভাবির চিঠি।

ফরিদ সাহেবের স্ত্রী?

জি।

সুন্দর হাতের লেখা।

সোবাহান চিঠি পকেটে রেখে দিল। জলিল সাহেব বললেন, কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

জি।

আরে, ছুটির দিনে কোথায় যাবেন? বসেন, গল্পগুজব করি।

কাজ আছে।

আরে ভাই রাখেন কাজ। চলেন ভিসিআর দেখে আসি। আমার চেনা জায়গা।

আরেকদিন যাব।

আরে না, আরেকদিন আবার কী! চলেন যাই। এমন জিনিস দেখবেন জীবনে ভুলবেন না। মারাত্মক ছবি।

সোবাহানকে বেরুতে হলো তার সঙ্গে। বারান্দায় যূথি দাঁড়িয়ে ছিল। জলিল সাহেব হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ?

মেয়েটা অস্পষ্টভাবে কী যেন বলল ঠিক বোঝা গেল না।

তোমরা বাইরের মানুষদের দাওয়াত করে খাওয়াও। আমাদের কথা তো মনে করো না। আমাদেরও তো মাঝে মাঝে ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছা করে। কী বলেন সোবাহান। সাহেব? করে না?

সোবাহান অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। রাস্তায় নেমে জলিল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, মেয়েটা অপুষ্ট কিন্তু তার বুক কেমন ডেভেলপ লক্ষ করেছেন। এর কারণটা বলতে পারেন? পারবেন না? হা হা হা! দুনিয়ার হালচাল কিছু দেখি জানেন না। আজকের দিনটা সময় দিলাম, দেখেন ভেবে-টেবে বের করতে পারেন কি না।

.

মগবাজার চৌধুরীপাড়ার বাড়িটা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বের করা গেল না। সোবাহান বিরক্ত হয়ে বলল, বাড়ি চিনেন না নিয়ে এলেন কেন?

আরে ভাই চিনি। চিনব না কেন? রাতের বেলা এসেছিলাম, তাই ঠিক ইয়ে হচ্ছে না। বাড়ির সামনে লোহার গেট।

লোহার গেট তো সব বাড়ির সামনেই।

তাও ঠিক।

ঘণ্টাখানিক খোঁজাখুঁজি চলল। জলিল সাহেব হাল ছাড়ার পাত্র নন। সোবাহান বলল, বাদ দেন, চলেন ফিরে যাই।

ফিরে গিয়ে তো সেই শুয়েই থাকবেন। আসেন আরেকটু দেখি। এই গলিটা চেনা লাগছে।

চেনা গলিতেও কিছু পাওয়া গেল না। জলিল সাহেবও একসময় হাল ছেড়ে দিলেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, লাচ্ছি খাবেন নাকি?

নাহ।

আরে ভাই খান, আমি পয়সা দেব।

পয়সা আমার কাছে আছে, আপনার দিতে হবে না। ইচ্ছে করছে না।

আরে চলেন চলেন।

লাচ্ছির দোকানটিতে ভিড় নেই। দৈয়ের উচ্ছিষ্ট খুড়িগুলিতে মোটা মোটা মাছি ভনভন করছে। ঘরের ভেতরে ভ্যাপসা গরম, তবে মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানের বাতাসও গরম।

জলিল সাহেব এক গ্লাস লাচ্ছি শেষ করতে আধা ঘণ্টা সময় নিলেন। লাচ্ছি শেষ করে পান আনালেন, সিগারেট আনালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, বুড়ো হয়ে গেছি, বুঝলেন। ছুটির দিনগুলিতে কী করব বুঝতে পারি না।

বিশ্রাম করেন।

বিশ্রাম করেই বা হবেটা কী? সংসার দরকার। ঝামেলা দরকার। ঝামেলা অশান্তি এইসব না থাকলে বেঁচে থাকা যায় না। পান খাবেন নাকি একটা? মুখের মিষ্টি ভাবটা যাবে।

জি-না, খাব না।

এই তো দেখেন না আমার সংসারের কোনো দায়দায়িত্ব নাই। ছোট বোন ছিল বিয়ে দিয়েছি। এখন আমার দিন চলে না। দুপুরবেলা দৈয়ের দোকানে বসে থাকি।

জলিল সাহেব, আমি এখন যাব।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল।

আরে এই রোদের মধ্যে কী যাবেন? বসেন বসেন, রোদ কমুক। আরেকটা লাচ্ছি খান।

আপনি খান।

সোবাহান রাস্তায় নেমে পড়ল। জলিল সাহেব লাচ্ছির শূন্য গ্লাস সামনে নিয়ে বসে রইলেন। তাকে ঘিরে নীল রঙের পুরুষ্ট মাছিরা উড়তে লাগল।

দুপুরে কোথাও যাওয়া যায় না। দুপুর হচ্ছে গৃহবন্দির কাল। সোবাহান উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল অনেকক্ষণ। আজও তার দুপুরে খাওয়া হয়নি। সকাল থেকে এ পর্যন্ত চা খাওয়া হয়েছে সাত কাপ। সমুচা দুটি। তিনটি নোতা বিস্কিট। এক গ্লাস লাচ্ছি। এখন ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। কিন্তু এ সময়ে হোটেলে উচ্ছিষ্ট খাবার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ভাত হয় কড়কড়া। বেয়ারাগুলি ঝিমায়। তিনবার ডাকলে তবেই

সাড়া দেয়। অসময়ের কাস্টমারদের প্রতি এদের কোনো মমতা নেই।

সূচিপত্র

সোবাহান মাঝারি সাইজের একটা হোটেলে ঢুকে পড়ল। এক প্লেট ভাত আর ডাল-গোশতের অর্ডার দিয়ে বসে রইল। ভাতের প্লেট নামিয়ে বয়টি দাঁত বের করে বলল, ডাল-গোশত নাই, ইলিশ মাছ আছে। আনুম?

বয়টির ডান হাতে একটা ফোঁড়া। সাদা হয়ে পেকে আছে। সোবাহানের ক্ষিধে মরে গেল।

কি, খাইবেন না?

না।

কোথায় খাওয়া যায়? খাওয়ার কি কোনো জায়গা আছে? সোবাহানের বমি বমি ভাব হলো। ভাতের থালাটির পাশে পেকে ওঠা ফোড়ার ছবিটি উঠে আসছে। কিছু কিছু ছবি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হতে থাকে। সে বাসে চাপা পড়া একটা কুকুর দেখেছিল। একবার। মাথাটা থেতলে মিশে গেছে। চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। সোবাহানের মনে হয়েছিল চোখ দুটি এখনো সবকিছু দেখছে। অবাক হয়ে জগতের নিষ্ঠুরতা দেখছে।

মৃত্যুর পর যেন চোখ দুটির দেখার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। এরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই, তবু মনে হয়। সোবাহান মিলিদের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

.

আরে সোবাহান ভাই, আপনি!

কেমন আছ?

ইস! এই রোদের মধ্যে কেউ আসে? হেঁটে এসেছেন, না?

ঘুমাচ্ছিলে নাকি?

আমি দিনে ঘুমাই না। যেসব মেয়ের বয়স একুশ তারা দুপুরে ঘুমায় না।

মিলি, ঠান্ডা দেখে এক গ্লাস পানি দাও।

একটু বিশ্রাম করে নিন। এখন ঠান্ডা পানি খেলে সর্দি-গর্মি হবে। আসেন বারান্দায়। বসেন। বারান্দায় ঠান্ডা।

সোবাহান বারান্দায় বসে রইল। গা দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। পুকুরে গলা। পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। মিলি তাকিয়ে আছে। কে বলবে এই মেয়ের বয়স একুশ। পনেরো-ষোল বছরের কিশোরীর মতো লাগছে। ভারী মিষ্টি একটি মুখ।

একটা টেবিল ফ্যান এনে দেই? নাকি ঘরের ভেতর ফ্যানের নিচে বসবেন?

এখানেই বসব। তুমি পানি আন।

মিলি পানি আনতে গেল। সোবাহান হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে সে আসে এ বাড়িতে। আসার তেমন কোনো কারণ নেই। মিলির বড় ভাইয়ের বন্ধু, সেই সূত্রে আসে।

নিন, পানি নিন।

শুধু পানি নয়, একটা প্লেটে দুটি সন্দেশ। সোবাহান লোভীর মতো সন্দেশ খেল। তার এতটা ক্ষিধে পেয়েছে আগে বোঝা যায়নি। মিলি সহজ স্বরে বলল, আপনি দুপুরে কিছু খাননি, তাই না?

হুঁ।

কেন, খাননি কেন?

সোবাহান না খাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করল না। আরেক গ্লাস পানি চাইল। মিলি বড় একটা কাঁচের জগে পানি নিয়ে এল। পানির ওপর বরফের টুকরো ভাসছে। কাঁচের জগটি ঝকঝক করছে। বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে চারপাশে দেখেই তৃষ্ণা কমে যায়।

সোবাহান ভাই, আপনি দুমাস পরে এলেন। আপনার কথা মা প্রায়ই বলেন।

খালা কেমন আছেন?

ভালো না।

এখনো কান্নাকাটি করেন?

হুঁ। এবং এখনো বিশ্বাস করেন ভাইয়া বেঁচে আছে। মিলিটারিরা তাকে পাকিস্তানে নিয়ে বন্দি করে রেখেছে।

বেশির ভাগ মা-ই তাই ভাবে। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয় ও হয়তো বেঁচেই আছে।

মিলি ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। শান্ত স্বরে বলল, খেতে আসুন সোবাহান ভাই। খাবার দেওয়া হয়েছে।

খাবার দেওয়া হয়েছে মানে?

দুপুরে তো খাননি। টেবিলে ভাত দিতে বলেছি।

চারটার সময় ভাত খেতে বসব নাকি?

হ্যাঁ বসবেন। আসুন। সিগারেট ফেলে দিন।

শোনো, মিলি।

অল্প চারটা খান। আসুন।

সোবাহানকে উঠতে হলো। হাত-মুখ ধুয়ে ভাত নিয়ে বসতে হলো। কাজের মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে দূরে। মিলি তার ধবধবে ফর্সা হাতে ভাত বেড়ে দিচ্ছে। হাতভর্তি লাল টকটকে কাঁচের চুড়ি। অদ্ভুত সুন্দর একটা ছবি। স্বপ্নদৃশ্যের মতো।

মিলি, বাসায় কেউ নাই?

না। আব্বা আম্মা খালার বাসায় গেছেন। ছ'টার মধ্যে এসে পড়বেন। আপনি কিন্তু মার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবেন না।

আরেকদিন আসব। আজ আমার যেতে হবে এক জায়গায়।

আপনি এলে মার সঙ্গে দেখা করতে চান না।

সোবাহান চুপ করে রইল। মিলি বলল, মা আপনাকে দেখলেই কান্নাকাটি করে তাই আপনার ভালো লাগে না। ঠিক না?

সোবাহান জবাব দিল না। মিলি বলল, এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? আস্তে আস্তে খান। ডাল নিয়ে ভালো করে মাখুন। শুকনা শুকনা খাচ্ছেন কেন?

সোবাহান কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। মিলি বলল, চাকরির কিছু হয়েছে আপনার?

নাহ।

মা যে আপনাকে এক ভদ্রলোকের কাছে যেতে বলেছিলেন, যাননি? রহমান সাহেব কে যেন।

এখনো দেখা হয়নি।

দেখা করবেন। আপনার চাকরি হবে।

আমার কিছু হবে টবে না মিলি। আমি গ্রামে চলে যাব।

এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?

অনেকদিন চেষ্টা করলাম। আর ভালো লাগে না। উঠি মিলি?

মিলি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। রোদের তাপ কমে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস, দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো। সোবাহান বড় রাস্তায় নেমে একবার পেছনে তাকাল। মিলি দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একধরনের কাঠিন্য আছে। সোবাহানের তবু মনে হলো, ঠিক এ ধরনের মেয়েদের কাছেই বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

একটা ভুল হয়ে গেল। মিলির বর কবে আসবে জিজ্ঞেস করা হয়নি। শিগগিরই তো আসার কথা। মিলির বরকে মিলি চোখে দেখেনি। বিয়ে হয়েছে টেলিফোনে। ভদ্রলোক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি। মিলির মতো একটি মেয়েকে পাশে পাওয়ার জন্যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি করতে ইচ্ছা করে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা কী?

.

০৮.

ফরিদ আলির কাছে দু’জন লোক এসেছে নবীনগর থেকে। তিনি তাদের চিনতে পারলেন না। তারা বয়সে ফরিদ আলির কাছাকাছি, কিন্তু দেখা হওয়ামাত্র পা ছুঁয়ে সালাম করল।

ফরিদ আলি যথেষ্ট অপ্রস্তুত হলেন। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। লোক দুটির একজন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, হুজুর, আপনার দোয়া নিতে এসেছি।

ফরিদ আলি খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। কিছুদিন ধরেই তার কাছে দূর দূর থেকে মানুষজন আসে। গত সপ্তাহেই নান্দাইল রোড থেকে একজন প্রাইমারি স্কুলের টিচার তাঁর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনও তিনি বলেছিলেন–"আমার কাছে কেন এসেছেন? আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি। আজও সেই কথা বললেন।

লোক দু'টি কী শুনে তাঁর কাছে এসেছে কে জানে। তারা জড়সড় হয়ে বসে রইল।

আপনারা নিশ্চয়ই খাওয়াদাওয়া করেন নাই?

জি-না।

বসেন। খাওয়াদাওয়া করেন। মাগরেবের নামাজের পর দোয়া করব।

হুজুর, ছেলেটা বাঁচবে?

ফরিদ আলি তাকালেন। খুব স্পষ্টভাবে বললেন, মানুষের মৃত্যু নাই। আত্মা বেঁচে থাকে। আত্মার কোনো বিনাশ নাই। মৃত্যুর কথা বলছেন কেন?

কথাটা বলে তার নিজেরও ভালো লাগল। সত্যিই তো মৃত্যু নিয়ে এত যে মাতামাতি তার কোনো অর্থ হয় না। আমরা সবাই এক মৃত্যুহীন জগতের বাসিন্দা।

আপনার ছেলেটার বয়স কত?

জোয়ান ছেলে, বিয়ে দিছি গত বৎসর।

কী হয়েছে?

জানি না হুজুর। রক্তবমি করতেছে।

হুজুর বলছেন কেন আমাকে? আমার নাম ফরিদ আলি। আমাকে নাম ধরে। ডাকবেন।

লোক দু'টি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

আল্লার নামের সাথে মিল রেখে আমাদের নাম। কাজেই নাম ধরে ডাকলে কোনো অপমান হওয়া ঠিক না। আপনারা হাত-মুখ ধোন, বিশ্রাম করেন, খানা আসবে।

.

এই গ্রামে একটি পাকা মসজিদ আছে।

ফরিদ আলি আগে মসজিদে যেতেন। গত কয়েক মাস ধরে যান না। বাংলাঘরে একা একা নামাজ পড়েন। ইদানীং অবশ্য একা একা নামাজ পড়া হয় না। অনেকেই এখানেই চলে আসে। কেন আসে? তিনি জানেন না, জানতেও চান না। নামাজের শেষে মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলতে চেষ্টা করেন। সেগুলি কি ওদের ভালো লাগে? বোধহয় লাগে। আজও

দেখা গেল অনেকেই এসেছে। নামাজের শেষে তিনি অন্যদিনের। মতো কিছু কথাবার্তা বললেন

সুখ ভোগ করবার জন্যে আমরা আসি নাই। পৃথিবীতে সুখ নাইরে ভাই। চারদিকে দুঃখ আর কষ্ট। এখানে কেউ কি আছেন যিনি বলতে পারেন তার কোনো দুঃখ নাই। আছেন কেউ?

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল। নবীনগর থেকে আসা লোকটি চোখ মুছতে লাগল। কথা বলতে বলতে ফরিদ আলির মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হলো এবং তার নিজের চোখ দিয়েও টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল

এমন কেউ কি আছেন যিনি আমাদের দুঃখহীন জগতে নিয়ে যাবেন? যে জগতে মৃত্যু নাই, ক্লান্তি নাই। দুঃখ নাই। হতাশা নাই। বঞ্চনা নাই।

ফরিদ আলি কথা শেষ করে যখন উঠলেন তখন অনেক রাত। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নবীনগরের লোক দুটিকে রাতে থেকে যেতে বলা হলো। তারা থাকল না। যাওয়ার সময় তারা আবার তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করতে এল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথা নিচু করা ঠিক না। তারা কী করবে বুঝতে পারল না। ফরিদ আলি বললেন, চলেন আপনাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

জি-না, জি-না। হুজুর, লাগবে না।

ফরিদ আলি তাদের কথা শুনলেন না। তাদের এগিয়ে দিলেন নিমাই খালের পুল পর্যন্ত। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফরিদ আলি আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন–চিন্তা করবেন না, আপনার ছেলে ভালো হয়ে যাবে। এই কথাটা কেন বললেন তিনি বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বলেই সংকুচিত হয়ে পড়লেন।

এই কথাটি কেন তিনি বললেন? কেন, কেন? তারা অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না। লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফরিদ আলি গাঢ় স্বরে বললেন, ভয়ের কিছু নাই, যান, বাড়ি যান।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ফরিদ আলি ভিজতে ভিজতে রওনা হলেন। বেশ লাগছে। তাঁর। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গা বেয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি বাড়ির দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে রওনা হলেন। সেখানে একটা শিমুল গাছ আছে। তার নিচে বসে থাকতে কেমন লাগে এটাই তার দেখার ইচ্ছা। কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা নেই, বসার জন্যেই বসা।

ঘণ্টাখানিকের মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেল। তারও বেশ কিছুক্ষণ পর হারিকেন হাতে তাকে খুঁজতে এল বাড়ির কামলা। ফরিদ আলি হাসি মুখে বললেন, কিরে রশীদ?

রশীদ বলল, ছোড ভাই আইছে।

তাই নাকি?

জি। সঙ্গে তাইনের বন্ধু আছে।

ফরিদ আলির মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি উল্লসিত বোধ করলেন।

.

০৯.

বুলু মুগ্ধ হয়ে গেল–আরে এ তো দেখি পোবন! সোবাহান নিজেও কম অবাক হয়নি। বাড়িঘর চেনা যাচ্ছে না। ঝকঝক তকতক করছে। নামাজঘরের সামনে চমৎকার বাগান। করা হয়েছে। বাড়ির উত্তরের বিশাল আমগাছটির নিচে লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। বুলু বলল, কেমন যেন শান্তি শান্তি ভাব চলে আসছে। থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

থেকে যা। দাড়ি রেখে মুরিদ হয়ে যা।

তুই মনে হচ্ছে বিরক্ত।

বিরক্ত ফিরক্ত না।

সন্ধ্যাবেলা অনেক লোকজন এল ফরিদ আলির কাছে। বুলু মহা উৎসাহে গেল কথাবার্তা শুনতে। সোবাহান বসে রইল গম্ভীর হয়ে। ভাবি বললেন–তুমি যাও, শুনে আসো। আমাদের বলো। মেয়েমানুষেরা তো আর শুনতে পারে না।

বহু লোকজন আসে নাকি ভাবি?

তা আসে। বড় বড় লোকজনও আসে।

বড় বড় লোকজন মানে?

গত সপ্তায় এক জজ সাহেব আসছিলেন।

বলো কী?

জিপ গাড়ি নিয়ে এসেছে। রাত আটটা পর্যন্ত ছিল।

জ্ঞানের কথা সব শুনল?

কী কথা শুনল জানি না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। এত সব কি জানি?

বুলু খুব আগ্রহ নিয়ে বক্তৃতা শুনল। ফরিদ আলি কখনো মৃদুস্বরে কখনো নিচুগলায় কথা বলতে লাগলেন

মানুষ পশুর মতো, তবে পশুর মধ্যেও ভালো জিনিস থাকে। যেমন বাঘ। বাঘের ভালো জিনিসটা হচ্ছে তার সাহস। সেরকম মানুষের মধ্যে, খারাপ জিনিসের মধ্যে অনেক ভালো জিনিস থাকে। ওই ভালোটা রেখে খারাপটা বাদ দিতে হবে। রসুল করিম হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলয়হেস সাল্লামের মধ্যেও কিছু খারাপ জিনিস ছিল। সেই জন্যে ফিরিশতা পাঠায়ে আল্লাহপাক তার বুক কেটে সেটা পরিষ্কার করলেন। আর আমরা তো অতি

নিম্নশ্রেণীর মানুষ, আমাদের মধ্যে খারাপ ভাবটা আরও বেশি। কাজেই রাত দিন আল্লাহপাকের কাছে আমাদের বলতে হবে, হে পাওয়ারদেগার, আমাদের ভালো করেন।

সমবেত প্রতিটি মানুষ একসঙ্গে বলল, আমাদের ভালো করেন। বুলুও বলল।

গভীর রাতে জিগির শুরু হলো, তবে ফরিদ আলি জিগিরে সামিল হলেন না। তিনি তাঁর নামাজঘরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে কোনো বাতি জ্বালানো হলো না। অন্ধকারে ছোট্ট ঘরটিতে তিনি এক রহস্যময় পুরুষের মতো বসে রইলেন। বাংলাঘরের মুসল্লিরা। তালে তালে আল্লাহু আল্লাহু করতে লাগল। তাদের মাথা নড়ছে গা কাঁপছে। চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। যারা এখানে জমা হয়েছে তারা সবাই কি রাতে ভরপেট খেয়েছে? বোধহয় না। অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। এরা কি এখানে ক্ষুধা ভুলে থাকার জন্যে এসেছে? বুলু জিগির করার ফাঁকে ফাঁকে গভীর আগ্রহে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার বড় ভালো লাগছে।

এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল। তৃতীয় দিনেই সোবাহান ঠিক করল চলে আসবে। ফরিদ আলি বেশ কয়েকবার থাকতে বললেন। সোবাহান প্রতিবারই বলল, না আমার ভালো লাগছে না।

কী, ভালো লাগছে না?

এইসব জিগির ফিগির।

না হয় এই কদিন জিগির হবে না। সবদিন তো হয়ও না।

সোবাহান ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, আপনি সারা রাত ওই বাংলাঘরে বসে থাকেন কেন? মানুষের ঘুমের দরকার নাই?

ঘুমাই তো। দিনে ঘুমাই।

বুলুর আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। সোবাহান তাকে নিয়ে জোর করে চলে এল। ফরিদ আলি স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। সারা পথে অসংখ্য লোক তাকে সালাম করল। একজন এগিয়ে এল ছাতা হাতে। রোদে যেন তার কষ্ট না হয়। তিনি মৃদু হেসে তাকে বললেন, রোদ তো আল্লাহর দান। রোদে কষ্ট হবে কেন? কোনো কিছুতেই কষ্ট নাই। কষ্ট মনে করলেই কষ্ট! সুখ মনে করলেই সুখ!

.

সোবাহান অফিসে ঢোকামাত্র রিসিপিশনের মেয়েটি বলল, আপনি অনেকদিন পরে এলেন। কী ব্যাপার, অসুখ-বিসুখ নাকি?

সোবাহান অবাক হলো। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বড় সাহেব আপনার খোঁজ করছিলেন।

উনি কি আছেন?

আছেন। আপনি বসুন। খবর পাঠাচ্ছি।

সে বসে রইল। রিসিপশনের মেয়েটিকে আজ আরও সুন্দর লাগছে। আজ সে। কালো রঙের একটি শাড়ি পরেছে। কালো রঙের শাড়িতে মেয়েদের এতটা সুন্দর লাগে তা তার জানা ছিল না।

যান, আপনি স্যারের ঘরে যান।

রহমান সাহেবের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে। অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা বলবার সময় চোখে পলক পড়ে না। এদের দেখলেই মনে হয় এরা। জন্মেছে বস হওয়ার জন্যে।

বসুন। আপনার নাম সোবাহান?

জি।

ওইদিন আপনি এরকম অশালীন আচরণ করলেন কেন? একজন মেয়েমানুষকে অপমান করে পৌরুষ দেখালেন?

সোবাহান জবাব দিল না। লোকটির ব্যক্তিত্বের তারিফ করল মনে মনে।

আপনি পড়াশুনা কতদূর করেছেন?

বিএ পাস করেছি।

কোন ক্লাস?

সেকেন্ড ক্লাস।

যে মহিলাদের সম্মান দেখাতে জানে না তাকে আমি এই অর্গানাইজেশনে চাকরি দিতে পারি না।

সম্মান অর্জন করতে হয়। অনেক মহিলা আছেন যাদের সম্মান দেখানোর কোনো কারণ নেই।

আপনি যেতে পারেন।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল। রহমান সাহেব বেল টিপতেই পিএ ছুটে এল এবং এমন ভাব করল যেন সে সোবাহানকে চিনতে পারছে না। রহমান সাহেব বললেন, ফরেন করেসপনডেন্স ফাইলে কোরিয়া ট্রেডার্সের কোনো চিঠি আছে কি না দেখুন তো।

সোবাহান লোকটির ব্যক্তিত্বের আবার প্রশংসা করল। লোকটি কত সহজেই বুঝিয়ে দিল– তুমি কীটস্য কীট। সোবাহান হাসিমুখে বলল, স্লামালিকুম।

রহমান সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। শীতল স্বরে বললেন, আপনি নিচে অপেক্ষা করুন, আমি ডাকব।

সে নিচে নেমে এল। রিসিপশনের মেয়েটি কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। যাওয়ার সময় তাকে কি কিছু বলে যাওয়া উচিত? এখানে আর তো নিশ্চয়ই আসা হবে না। সোবাহান ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু কথা শেষ হচ্ছে না। বেশ মেয়েটি।

চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

স্যার কী বললেন?

তেমন কিছু না।

মেয়েটি মনে হলো বেশ অবাক হয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু কি আছে এর মধ্যে?

সোবাহান হঠাৎ বলে বসল, আপনার নাম জানা হয়নি।

আমার নাম ইয়াসমিন। নাম দিয়ে কী করবেন?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না।

চা খাবেন?

নাহ্।

খান, এক কাপ চা খান।

মেয়েটি কাকে যেন ইশারা করল। হালকা গলায় বলল, আমার ধারণা ছিল আপনার। চাকরিটা হবে।

এরকম ধারণার কারণ কী?

কারণ স্যারকে দেখলাম আপনাকে নামে চেনেন। আমাকে বলে রেখেছিলেন সোবাহান নামের কেউ এলে তাকে খবর দিতে। আপনার নিশ্চয়ই ভালো রেফারেন্স আছে।

নাহ, তেমন ভালো নেই। থাকলে এ অবস্থা হওয়ার কথা না।

তাও ঠিক।

সোবাহান লক্ষ করল মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। কী দেখছে কে জানে। দেখার মতো কী আছে তার মধ্যে?

আপনি রুমাকে যে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন তাতে আমরা সবাই খুব খুশি। থ্যাংকস।

রুমা কে? রহমান সাহেবের পিএ?

হ্যাঁ।

সোবাহান বেতের সোফায় বসে রইল সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা পিএ এসে বলল, আজ দেখা হবে না। স্যারের প্রেসার বেড়েছে।

সোবাহানের চোখের সামনেই রহমান সাহেব বের হয় গেলেন। পলকের জন্যে তাকালেন সোবাহানের দিকে।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি বলল, আপনি পরশু আসুন। একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে।

দেখি।

না, দেখাদেখি না। আসুন। এত অল্পতে ধৈর্য হারানো ঠিক না।

ধৈর্য আছে। এখনো হারাইনি।

তারা দুজন একসঙ্গে বেরুল। সোবাহান পাশাপাশি হাঁটছিল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে–কোনো রেস্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা খাবেন? কিন্তু বলল না। বাংলাদেশে মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা কোনো রেস্টুরেন্টে বসে চা খায় না। সোবাহান বলল–আচ্ছা চলি? মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। হয়তো অভ্যাসের হাসি, তবু দেখতে ভালো লাগে। এই মেয়েটির দাঁতগুলি সুন্দর। কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করে কে জানে।

সোবাহান ঘরে ফিরল রাত এগারোটায়। জলিল সাহেব বললেন, এত দেরি করলেন? আপনার বন্ধু বুলু সাহেব সন্ধ্যা থেকে বসে ছিলেন। খুব নাকি দরকার।

কী দরকার?

তা তো বলেন নাই, চিঠি লিখে গেছেন। ড্রয়ারে চিঠিটা আছে, পড়ে দেখেন।

চিঠিতে তেমন কিছু লেখা নাই। ইংরেজি বাংলা মিশানো যা আছে তার কোনে পরিষ্কার অর্থও হয় না। বোঝা যায় যে, একটা ইম্পর্টেন্ট খবর আছে। সে খবরটি কী সে সম্পর্কে কিছুই নাই।

জলিল সাহেব চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, ব্যাপারটা কি কিছু বুঝতে পারছেন?

নাহ্।

খারাপ কিছু না তো?

না, খারাপ আর কী হবে? চাকরি হয়েছে বোধহয়।

চলেন না যাই খোঁজ নিয়ে আসি।

এত রাতে কোথায় যাব!

সোবাহান কোনো উৎসাহ দেখাল না। নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুমোতে গেল। ঘুম আসবে না জানা কথা। অনেক রাত জেগে থাকার পর খানিকটা তামতে হবে। ব্যস। কিংবা এও হতে পারে সারা রাত জেগে কাটবে।

রাত একটা পর্যন্ত ঘুমোবার চেষ্টা করে সোবাহান মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। জলিল সাহেব আলো জ্বালিয়ে কী যেন পড়ছেন।

কী পড়ছেন?

তেমন কিছু না রে ভাই। ফুটপাতের একটা বাজে বই। আপনার মতে ইয়াংম্যানদের পড়া ঠিক না।

জলিল সাহেব, আপনি কি কোনো মেয়েকে দেখে বলতে পারেন মেয়েটি বিবাহিতা অবিবাহিতা?

জলিল সাহেব খানিকক্ষণ কুঁচকে রেখে বললেন, বলাটা ডিফিকাল্ট। বলতে হলে বিছানায় নিতে হবে। হা হা হা।

সোবাহান বারান্দায় গিয়ে বসল। জলিল সাহেব ভেতর থেকে বললেন, কি ভাই রাগ করলেন নাকি? বয়স হয়েছে, দুএকটা বেফাঁস কথা বলে বসি। এতে মাইন্ড করা ঠিক না।

মাইন্ড করিনি।

আপনি কি ভাই বিবাহিতা কারুর সঙ্গে কিছু বাধিয়ে বসেছেন? সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার। সুখে আছেন ভাই। বয়সটাই আপনাদের ফেভারে। জীবনটা কেটে গেল ভেজিটেবলের মতো। বহুত আফসোস হয়, বুঝলেন?

জলিল সাহেব বারান্দায় এসে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, ফ্যামিলি লাইফের একটা চার্ম আছে। এই ধরেন, ফ্যামিলি থাকলে এ সময়ে লেবুর শরবত বানিয়ে খাওয়াত। মাথা টিপে দিত।

সোবাহান বলল, আপনার মাথা ধরেছে নাকি?

জলিল সাহেব জবাব দিলেন না।

মাথা ধরা থাকলে সিগারেট খাবেন না।

মাথা ধরে নাই। কটা বাজে?

একটার উপরে।

সামনের রাস্তায় লোক চলাচল নেই। গলির মোড়ের সিগারেটের দোকান একটার। দিকে ঝাঁপ ফেলে দেয়। আজ ফেলছে না। অল্পবয়েসী কিছু ছোঁকরা ঘোরাঘুরি করছে সেখানে। জলিল সাহেব ওই দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বললেন, ওদের মতলবটা কিছু বুঝতে পারছেন?

জি-না।

গাঁজা খাবে। রাত একটার পর ওই দোকানে গাঁজা বিক্রি হয়।

তাই নাকি?

সূচিপত্র

হুঁ। খাবেন নাকি?

নাহ্।

ইচ্ছা হলে চলেন যাই, দেখি জিনিসটা কী! দু'টাকা করে নেয়। সিগারেটের মধ্যে ভরে দেয়।

না, ইচ্ছা করছে না।

সবকিছু ট্রাই করতে হয়। জীবনে আছে কী বলেন? মরবার সঙ্গে সঙ্গেই তো ফুটটুস। কি ঠিক বললাম না?

জি ঠিকই বলেছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন যাই চা খেয়ে আসি।

রাতে চা কোথায় পাবেন?

ঢাকা শহরে একটার সময় চা পাওয়া যাবে না? বলেন কী? যান সার্টটা গায়ে দিয়ে আসেন।

বড় রাস্তায় দুটি চায়ের দোকান ভোলা পাওয়া গেল। একটিতে ইংরেজি গানের ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে। জলিল সাহেব গানের দোকানটিতেই বসলেন। চা খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বসে রইলেন। সোবাহান বলল, যাবেন না?

আরে বসেন না, গান শুনি। বাড়িতে গিয়ে তো সেই ঘুমাবেন। ভালোই লাগছে তো গান শুনতে। লাগছে না?

সোবাহান কিছু বলল না।

বেঁচে থাকতে হলে আনন্দ দরকার। চা খাবেন আরেক কাপ?

জি-না।

দৈ খাবেন? খান, পয়সা আমি দেব।

জি-না। আমি উঠব, ঘুম পাচ্ছে। আপনি কি আরও কিছুক্ষণ বসবেন?

বসি কিছু সময়। ঘরে গিয়ে করবটা কী?

জলিল সাহেব আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গানের তালে মাথা নাড়তে লাগলেন। যেন খুব মজা পাচ্ছেন।

সোবাহানের মনে হলো–বেচারাকে ফেলে আসাটা ঠিক হয়নি। আরও খানিকক্ষণ বসলেই হতো। ঘরে গিয়ে তো ঘুমানো যাবে না। দরজা খুলবার জন্যে জেগে থাকতে হবে। তিনি কখন আসবেন তারও ঠিক নেই। দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

.

১০.

নামাজঘরটি ফরিদ আলির পছন্দ হয়েছে।

একটি মাত্র দরজার গোলাকার ছোট্ট ঘর। মেঝে মোজাইক করার ইচ্ছা ছিল—টাকার টান পড়ে গেল। তাতে ক্ষতি হয়নি। কালো সিমেন্টের প্রলেপে ভালোই লাগছে দেখতে।

ঘরের ভেতরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। অন্ধকার বলেই রহস্যময়। উপাসনার ঘর রহস্যময় হওয়াই তো উচিত। বসতবাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজের মতো দূরে। এটাও ভালো। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে থাকাই ভালো।

ফরিদ আলি সমস্ত দুপুর সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করলেন। তার বাড়ির কামলা রোস্তম বলল, আমি সাফ কইরা দেই বড় মিয়া? ফরিদ আলি বললেন, না। এই ঘরে আমি ছাড়া কেউ ঢুকবে না।

রোস্তম তাকাল অবাক হয়ে।

নির্জনে আল্লাহ খোদার নাম নিতে চাই রোস্তম। নির্জনেই আল্লাহকে ডাকা উচিত। উচিত না?

জি উচিত।

সন্ধ্যাবেলা ফরিদ আলি ভেতরবাড়িতে অজু করতে গেলেন। অজুর পানি দিতে দিতে পারুল বলল, আপনের সাথে আমার কথা আছে।

ফরিদ আলির কপালে ভাঁজ পড়ল। পারুল তাকে তুমি করে বলত। এখন আপনি করে বলছে। রোজই ভাবেন জিজ্ঞেস করবেন–এর কারণটি কী? জিজ্ঞেস করা হয় না। লজ্জা লাগে। ফরিদ আলি অজু শেষ করে বললেন, বলো কী বলবে?

নামাজ শেষ কইরা আসেন তারপর বলি।

না, এখনই বলো। নামাজ শেষ করে আমি আজ আর বাড়ি ফিরব না। রাত কাটাব নামাজঘরে।

কেন?

ইবাদত বন্দেগি করব। ঘর তো সেজন্যেই বানালাম।

ভিতরের বাড়িতে ইবাদত বন্দেগি করা যায় না?

গণ্ডগোল হয়। মনে বসে না। বলো, তুমি কী বলতে চাও?

অন্যদিন বলব। আপনের নামাজের সময় হইছে। নামাজ পড়তে যান।

ফরিদ আলি বাংলাঘরে গিয়ে দেখেন নামাজ পড়ার জন্যে অনেকেই বসে আছে। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আজ থেকে একা একা আল্লাহকে ডাকবেন।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

আপনারা কিছু মনে করবেন না।

জি-না জি-না। তবে আপনার দু'একটা কথা শুনতে বড় ভালো লাগে। মনে শান্তি হয়।

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরেবের পর আপনাদের সাথে কথা বলব।

জি আচ্ছা। জি আচ্ছা।

আর বলবই বা কী বলেন? আমি কী জানি? কিছুই জানি না। বোকার মতো যা মনে আসে বলি। আল্লাহর কাছে গুনাগার হই।

সমবেত মুসল্লিরা অভিভূত হয়ে পড়ে। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ফরিদ আলি নামাজঘরে ঢুকে পড়েন। ঘরের রহস্যময় আলো-আঁধার তাঁর বড় ভালো লাগে।

ভেতরবাড়িতে ফিরতে ফিরতে তাঁর রাত দশটা বেজে যায়। পারুল ভাত বেড়ে দেয়। তরকারি গরম করে আনে। ভাত মাখতে মাখতে ফরিদ আলি নিচুস্বরে কথা বলেন, কী যেন বলতে চেয়েছিলে?

তেমন কিছু না। আপনে ভাত খান। ডাইল নেন।

বলার থাকলে বলো।

পারুল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনে আরেকটা বিয়া করেন। সংসারে ছেলেপুলে আসলে মনে শান্তি আসে।

আমার মনে শান্তি আছে।

না, শান্তি থাকলে মানুষ এই রকম করে না।

কী করলাম আমি?

বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করতেছেন। এইসব আপনের একার না। সোবাহানের অংশও আছে।

সোবাহানকে জিজ্ঞেস করেছি।

আপনে জিজ্ঞাস করলে সে না বলবে না। তবু এইটা উচিত না।

ফরিদ আলি গম্ভীর মুখে বললেন, আমি ধর্মকর্ম করি এটা চাও না তুমি?

ধর্মকর্ম নিয়া আপনি বাড়াবাড়ি করেন এইটা ঠিক না। মানুষের সংসারি হওয়া লাগে। আপনার উপর দায়িত্ব আছে।

কী দায়িত্ব?

সোবাহানের বিয়া দিবেন না?

তার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। ওই নিয়ে চিন্তা করবার কিছু নাই। সব ঠিক আছে।

পারুল বিস্মিত হয়ে বলল, কোন জায়গায় ঠিক করলেন?

ঢাকায়। মেয়ের নাম যূথি। ভালো মেয়ে।

সোবাহান মেয়ে দেখছে? সে রাজি আছে?

রাজি অরাজির কী আছে? আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে ওইখানে বিয়ে হবে। ইচ্ছা না থাকলে হবে না।

ওই মেয়ের কথা তো আমাকে কিছু বলেন নাই।

এই তো বললাম। আর কী জানতে চাও?

ফরিদ আলি উঠে পড়ে শান্তস্বরে বললেন, আজ রাতটা আমি নামাজঘরে কাটাব।

ওইখানেই ঘুমাবেন?

না, ঘুমাব না। এবাদত বন্দেগি করব।

রাতে আর ফিরবেন না?

ফজরের নামাজের শেষে ফিরব। আমাকে একটা পান দাও।

পারুল পান এনে দিল। ফরিদ আলি বিছানায় আধশোয়া হয়ে পান খেলেন। পারুল কিছুই বলল না।

নামাজঘরে ঢোকবার আগে ফরিদ আলি সোবাহানকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন।

তাঁর মনে আজ খুব আনন্দ। চিঠি লিখতে লিখতে তাঁর গভীর আবেগ উপস্থিত হলো। বেশ কয়েকবার তাঁকে চোখ মুছতে দেখা গেল। পারুল তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। দীর্ঘ দিনের চেনা লোক কত দ্রুতই না অচেনা হয়ে যাচ্ছে! ফরিদ আলি চোখ তুলে তাকালেন। শান্তস্বরে বললেন, কী দেখছ?

না, কিছু না।

একটা চিঠি দিলাম সোবাহানকে। বিয়ের কথাটা লিখলাম। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার একটা দায়িত্ব শেষ হয়। অজুর পানি দাও। অজু করে চলে যাব।

রাতে আসবেন?

না।

ফরিদ আলি উঠানে বসে অনেক সময় নিয়ে অজু করলেন। উঠানে ফকফকা জ্যোৎস্না। দেখতে খুব ভালো লাগে। পারুল দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে। তাকে নতুন বিয়ে হওয়া কিশোরীর মতো লাগে।

প্রায় চৌদ্দ বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে। পনেরোও হতে পারে। এত দীর্ঘ সময় তারা একসঙ্গে আছে এটা মনেই থাকে না। পারুলকে এখনো অচেনা লাগে।

১১-১৫. বেলা এগারোটায় সোবাহান

বেলা এগারোটায় সোবাহান বুলুদের বাসার কড়া নাড়ল। আজ যে ছুটির দিন এটা সোবাহানের মনে ছিল না। বেকার যুবকরা দিনের হিসাব ঠিকমতো রাখতে পারে না। ছুটির দিনে বুলুদের বাসায় গেলে বুলু খুব রাগে। আজও নির্ঘাৎ রাগবে। দরজা খুললেন বুলুর মামা। ভদ্রলোক মিউনিসিপ্যালিটিতে কেরানিগিরি করেন। এত অল্প বেতনের চাকরিতেও তিনি কী করে এমন বিশাল একটি শরীর বানিয়েছেন কে জানে। বাংলাদেশী কিংকং। পালোয়ানদের মতো মাথাটা পর্যন্ত কামানো। সোবাহান কাঁচুমাচু মুখে বলল, বুলু আছে?

আছে। কেন?

একটু দরকার ছিল।

মামা বিরক্ত স্বরে ডাকতে লাগলেন, এই বুলু! বুলু!

বুলুর সাড়া পাওয়া গেল না।

ওর জ্বর, শুয়ে আছে বোধহয়। অন্য আরেকদিন এসো। নাকি কোনো বিশেষ দরকার?

বিশেষ দরকার। একটা চাকরির ব্যাপারে।

আর চাকরি–ওর কপালে চাকরি ফাঁকরি নাই। যাও ভেতরে চলে যাও। বুলুর ঘর চেনো তো?

চিনি।

বুলু চাঁদর গায়ে বিছানায় পড়ে ছিল। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে সন্ন্যাসীর মতো লাগছে। সে বিরক্ত গলায় বলল, কতদিন বলেছি ছুটির দিনে আসবি না।

তোর কী হয়েছে?

জন্ডিস।

কতদিন হলো?

তা দিয়ে কী করবি? ওইদিন অসুখ শরীরে খবর দিয়ে এলাম–তুই একটা খোঁজ তো নিবি! কী ব্যাপার!

কী ব্যাপার?

বুলু জবাব দিল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

সোবাহান সিগারেট বের করল। বুলু বিরক্ত মুখে বলল, সিগারেট ধরাস না।

কেন?

মামা রাগ করে।

রাগ করার কী আছে? বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে এখনো সিগারেট খেতে পারবি না?

আস্তে কথা বল। সিগারেট খেতে হলে বাইরে গিয়ে খেয়ে আয়।

আমি উঠলাম। যেদিন মামা থাকবে না সেদিন আসব।

আরে বস বস। কথা আছে। চায়ের কথা বলে আসি।

সোবাহান চমকাল। এটা নতুন কথা। বুলু কাউকে চা খেতে বলে না। মোড়ের চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। বুলু ফিরে এসেই শুয়ে পড়ল। নিস্পৃহ গলায় বলল, চা আসছে। মামিকে বলে এসেছি।

ব্যাপার কী? রাজার হালে আছিস মনে হয়। চাকরি হয়েছে নাকি?

এখনো হয় নাই। হবে। শিগগিরই হবে।

বলিস কী! কোথায়?

পিডিবিতে।

ম্যানেজ করলি কীভাবে?

ঘুষ। সাত হাজার দিয়েছি। দশ হাজার চেয়েছিল।

পেলি কোথায় এত টাকা? মাই গড!

বুলু গম্ভীর হয়ে গেল। চা দিয়ে গেল ওদের কাজের মেয়ে। কাপে কাঁচা মাছের গন্ধ। এক চুমুক খেয়েই সোবাহান কাপ নামিয়ে রাখল। বমি আসছে।

চা খাবি না?

না, মাছের গন্ধ।

বুলু কিছু বলল না। তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চোখের বর্ণ হলুদ। মাথার চুলও মনে হয় পড়ে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মাথা।

তোর কি টাক পড়ে যাচ্ছে নাকি?

হুঁ। বাবার টাক ছিল। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া। টাকাপয়সা কিছু পাই নাই। এটাই পেয়েছি।

ঘুষের টাকা জোগাড় করলি কীভাবে?

বুলু গলার স্বর দুধাপ নামিয়ে ফেলে বলল, রেশমা দিয়েছে।

বলিস কী?

হুঁ। চার হাজার টাকা সোনার ভরি। তিন গাছি চুড়ি দিয়েছে। একেকটা একেক ভরি। ভরিতে পাঁচ আনা করে খাদ কেটে ন'হাজার টাকা হয়েছে।

বাকি দু'হাজার টাকা কী করলি?

করব আবার কী, আমার কাছেই আছে।

তোর মামা এসব জানে না?

নাহ।

রেশমার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা লাগল না?

নাহ্। তুই এখন যা সোবাহান। মাথা ঘুরছে। শুয়ে থাকব খানিকক্ষণ।

সোবাহান তবুও বসে রইল। বুলুর এখানে আসা হয় না। অনেকটা দূর। এসেই চট করে চলে গেলে পোষায় না। একটার দিকে সোবাহান বলল, চায়ের দোকানে যাবি নাকি?

আরে না। আমার উঠার শক্তি নাই। তুই এখন যা। নাকি পয়সার দরকার? লজ্জা করিস না, বল।

না।

দরকার থাকলে বল। ওই দু'হাজার টাকা থেকে দেব। এক মাসের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। ওটা আমার বিয়ের টাকা। চাকরি হলেই বিয়ে করব।

চাকরি হবে কবে নাগাদ?

বারো তারিখে ইন্টারভ্যু। সামনের মাসের এক তারিখে জয়েন করতে হবে।

বিয়ে কি সামনের মাসেই হবে?

হুঁ। কি, তোর লাগবে কিছু?

নাহ্।

লজ্জা করিস না।

রেশমা আছে কেমন?

ভালোই আছে।

তোর অসুখের খবর জানে?

নাহ্।

যদি চাস তো খবর দিয়ে আসতে পারি।

কী হবে খবর দিয়ে। খামাখা দুশ্চিন্তা করবে। সোবাহান, আজ তুই বাড়ি যা, কথা বলতে ভালো লাগছে না।

বাড়ি কোথায় যে যাব?

অন্য কোথাও যা। অন্যদের বিরক্ত কর।

ঘরের ভেতর থেকে মামার হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। ঝনঝন করে কিছু একটা ভাঙল। বাচ্চা একটা মেয়ে কাঁদতে শুরু করল। বুলু মৃদুস্বরে বলল, মামার রাগ উঠে যাচ্ছে। উঠ সোবাহান, আর না। আবার ঝন ঝন করে কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলা হলো। মামার গলা শোনা গেল–সব কয়টাকে খুন করে ফেলব। পাগল বানাতে বাকি রেখেছে। উফ!

সোবাহান নিচুস্বরে বলল, এরকম রোজ হয় নাকি?

রোজ হয় না, মাঝে মাঝে হয়। আমি বাজারে যেতে পারছি না। তাই রাগ উঠে গেছে।

রাগ কতক্ষণ থাকবে?

কিছু একটা না-ভাঙা পর্যন্ত থাকবে। তুই এখন উঠ প্লিজ।

চিকিৎসা করাচ্ছিস, না শুয়ে আছিস শুধু?

শুয়েই আছি। জণ্ডিসের কোনো চিকিৎসা নেই।

অড়হড়ের পাতা সিদ্ধ করে রস খা।

অড়হড়ের পাতা পাব কোথায়! যত ফালতু বাত। উঠ তো।

বুলু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। ক্লান্তস্বরে বলল, আর যাব না। হাঁটতে পারছি না। তুই এক কাজ কর, এই দুপুরে না খেয়ে যাবি কী। হোটেলে ভাত খেয়ে যা। পয়সা দিতে হবে না। বাকিতে খা, আমি পরে দিয়ে দেব।

দরকার নাই।

দরকার আছে। তুই যা। খাসির মাথা আর ডাল আছে। খারাপ না, ভালোই। আয় আমার সাথে, আমি বলে দেই–বিসমিল্লাহ হোটেল।

বুলু সোবাহানকে হোটেলে বসিয়ে চলে গেল। এই হোটেলে বুলু প্রায়ই খায়। বাসা ফেলে তাকে হোটেলে কেন খেতে হয় কে জানে!

সোবাহান দু'টার দিকে হোটেল থেকে বেরুল। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ছুটির দিন অফিস টফিস বন্ধ, নয়তো যে সব বন্ধুরা ঢাকায় চাকরি বাকরি করছে তাদের কাছে যাওয়া যেত। উত্তরা ব্যাংকের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে আছে সফিক। তার কাছে গেলেই সে চা নাশতা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফেরার পথে জোর করে পাঁচ টাকার একটা নোট পকেটে ঢুকিয়ে দেয়–এটা নাকি তাকে দেখতে আসার ফি। সফিক এটা যে শুধু সোবাহানের জন্যে করে তাই না, সবার জন্যে করে। সব বেকার বন্ধুদের জন্যে এই ব্যবস্থা। এ জন্যেই সফিকের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।

আবার উল্টো ধরনের চরিত্রও আছে। মতিঝিলের করিম। যে বেশ কিছুদিন ধরেই অফিস ম্যানেজার না কী যেন হয়ে বসে আছে। গরমের মধ্যে তাকে সার্ট ও টাই পরতে হয়। করিম এদের কাউকে দেখলেই বিরক্ত হয়ে বলে–কতদিন বলেছি অফিসটাইমে কেউ গল্প করতে আসে? তোদের কি মাথা টাথা খারাপ?

অফিসটাইম ছাড়া তোকে পাব কোথায়?

এখন যা, এখন যা। আমার কাজ আছে।

কী কাজ?

সদরঘাট যেতে হবে। একটা মাল ডেলিভারি নিতে হবে।

তোকে তো ধরে রাখছি না। তুই যা, আমরা ঠান্ডা ঘরে বসি খানিকক্ষণ। আড্ডা দেই। তুই তোর মাল নিয়ে আয়।

অফিস আড্ডা দেওয়ার জায়গা নাকি?

করিম রাগে চিড়বিড় করতে থাকে।

করিমের হতাশ মুখ দেখতে বড় ভালো লাগে সবার। অ্যাশট্রেতে ছাই না ফেলে ওরা ইচ্ছা করে মেঝেতে ছাই ফেলে। হো হো করে হাসে। করিমের অফিসের সুন্দরী স্টেনোটি হেডমিস্ট্রেসের মতো চোখে তাকায়।

ছুটির দিনে এদের কারও কাছেই যাওয়া যায় না। বেকার বন্ধুদের কাছেও যাওয়া যায় না। ওদের সেদিন নানান কাজ থাকে। সপ্তাহের বাজার করতে হয়। এর বাড়ি ওর বাড়ি যেতে হয়। বুলুর কথাই ঠিক–ছুটির দিনে যে সবচেয়ে ব্যস্ত থাকে সে হচ্ছে একজন বেকার।

রোদ মরে আসছে। সোবাহান আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ। আকাশ বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। জোর বৃষ্টি হবে। সোবাহানের মন হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। বুলু এই কথাটিও ঠিক বলে–আকাশে মেঘ দেখলে সবচেয়ে খুশি হয় বেকার যুবকেরা।

সোবাহান একটা পান কিনল। এবং ঝট করেই দেড় টাকা খরচ করে একটা ফাইভ ফাইভ কিনে ফেলল। মাঝে মাঝে বিলাসী হতে ইচ্ছা করে। অকারণে দেড় টাকা ছাই করে ফেলার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে।

বিকাল পাঁচটার দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির আগে আগে সোবাহান চলে গেল মালিবাগে। রেশমা মালিবাগে থাকে। তবে তাকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে? তাকে কখনো পাওয়া যায় না। সবসময় তার ডিউটি পড়ে অসময়ে। গত বছরই ডিটটি পড়ল ঈদের দিন।

রেশমার বাবা দরজা খুলে দিলেন।

রেশমা আছে?

হ্যাঁ আছে। বসেন।

আমাকে চিনেছেন?

জি। আপনি বুলবুলের বন্ধু। বসেন।

আপনার শরীর কেমন?

ভালো না। বসেন রেশমাকে ডাকি।

ঝড়ের আশঙ্কায় জানালা-টানালা সব বন্ধ। ঘরের ভেতরে গুমোট। হাওয়া ভারী হয়ে আছে। সোবাহান জানালা খুলে দিতেই রঙিন পর্দা পালের মতো উড়তে লাগল। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টিনের ছাদ। ঝমঝম করে শব্দ হচ্ছে। অপূর্ব।

সোবাহান ভাই, কেমন আছেন?

রেশমা গোসল করে এসেছে। চুলে গামছা জড়ানো। জলের সঙ্গে মেয়েদের কোনো একটা সম্পর্ক হয়তো আছে। গা-ভেজা সব মেয়েকেই জলকন্যার মতো লাগে।

আপনি এখানে এলেন প্রায় দু'মাস পর।

সোবাহান হাসল। মেয়েরা দিন-ক্ষণের হিসাব খুব ভালো রাখে।

আপনার বন্ধু বলছিল আপনি নাকি এক বুড়োর সঙ্গে থাকতে থাকতে বুড়োদের মতো হয়ে গেছেন। কথা টথা কম বলেন।

বুড়োরা কথা কম বলে নাকি? আমার তো ধারণা ওরা কথা বলে সবচেয়ে বেশি।

কথা বেশি বলে রোগীরা। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়।

সোবাহানের ভয় হলো রেশমা হয়তো হাসপাতালের গল্প শুরু করবে। নার্সরা। রোগীদের গল্প খুব আগ্রহ নিয়ে বলে। সে গল্পে সবকিছুই থাকে–রোগীর বয়স, তার বাড়ি, তার ছেলেমেয়ে; কিন্তু রোগের কথা থাকে না। রোগের যন্ত্রণার প্রসঙ্গ একবারও আসে না। সোবাহান কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে বলল, বুলুর কাছে গিয়েছিলাম।

কেমন আছে আপনার বন্ধু?

বেশি ভালো না, জণ্ডিস হয়েছে।

কী ধরনের জণ্ডিস? ইনফেকটাস হেপাটাইটিস?

তা তো জানি না।

বিলরুবিন টেস্ট করিয়েছে?

জানি না। খুব সম্ভব না।

রেশমা হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে এল। হাসিমুখে বলল, চায়ের সঙ্গে কী খাবেন?

কী আছে?

কিছুই নাই। আনাব। মুড়ি ভেজে দেই?

দাও।

আপনি বসে বসে ঝড়বৃষ্টি দেখেন। আমি চা নিয়ে আসছি। দেরি হবে না।

রেশমা, একটা সিগারেটও আনতে বলবে।

সোবাহান বসে রইল একা একা। বসার ঘরটা ছোট হলেও বেশ গোছানো। সুন্দর। একটা শোকেস আছে। যার নিচের তাকে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসের বই। বইগুলির একটিও মলিন নয়। ঝকঝক করছে। রেশমা বই পড়ে মলাট লাগিয়ে। পড়া হলেই মলাট খুলে শোকেসে তালা লাগিয়ে দেয়। বুলু একবার কী একটা বই নিয়ে তরকারির সরুয়া ভরিয়ে ফেরত দিল। রেশমা রাগে তিনদিন কথা বলল না।

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। জ্বালাতে গেলে হয়তো। দেখা যাবে কারেন্ট নেই। সোবাহান নিচু হয়ে বসে বইগুলির নাম পড়তে চেষ্টা করল। গল্পের বই-টই অনেকদিন পড়া হয় না। কী হবে গল্পের বই পড়ে? একজন বানানো মানুষের কথা পড়ে কী লাভ? সেই বানানো মানুষটি প্রেম করে হাসে কাঁদে। কী আসে যায় তাতে? কিছুই আসে যায় না।

সোবাহান ভাই, চা নেন। ঘর অন্ধকার করে বসে আছেন কেন? এই নেন সিগারেট।

কাগজে মোড়া দুটো সিগারেট রেশমা বাড়িয়ে দিল।

একটার কথা বলেছিলাম, দুটো আনলে কেন?

মেয়েরা কোনো জিনিস একটা দেয় না।

চা কিন্তু এক কাপ দিয়েছ।

রেশমা হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার বন্ধু কি গয়না প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেছে?

বলেছে।

আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল কাউকে বলবে না। এখন আমার মনে হয় সবার কাছেই বলে বেড়াচ্ছে। এটা ঠিক না।

প্রতিজ্ঞা করা হয় প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই। এটাই নিয়ম।

রেশমা কিছু বলল না, গম্ভীর হয়ে রইল। সোবাহান বলল, ওর চাকরিটা খুব দরকার। কিছু না হলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আপনার দরকার নাই?

আমারও দরকার। তবে ওর যেমন চাকরি পেলেই বিয়ে করার প্ল্যান আমার তো তেমন কিছু নেই।

রেশমা বলল, ওর অসুখ কি খুব বেশি?

খুব বেশি না। আমার সঙ্গে তো হোটেল পর্যন্ত এল।

আপনার অসুখের কী অবস্থা?

আমার আবার কী অসুখ?

ও বলছিল রাতে নাকি আপনি ঘুমাতে পারেন না। শুধু মনে হয় কানের কাছে মশা পিন পিন করছে।

বুলু বলেছে না?

হ্যাঁ। তাছাড়া আপনার স্বাস্থ্যও অনেক খারাপ হয়েছে। দাড়ি কামান না কেন?

যেদিন ইন্টারভ্যু থাকে সেদিন সকালে কামাই। আজ কোনো ইন্টারভ্যু ছিল না।

ও বলছিল আপনার নাকি একটা চাকরি হবে হবে করছে।

জানি না।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল।

এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কোথায়?

আমার ভিজে অভ্যাস আছে। কিছু হবে না।

রেশমার বাবা বসে আছেন বারান্দায়। তিনি যন্ত্রের মতো বললেন, আবার আসবেন।

রেশমার বিয়ের পর এই ভদ্রলোক কোথায় থাকবেন? মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে থাকতে তার কেমন লাগবে? তাঁকে অবশ্যি থাকতেই হবে। তার জায়গা নেই। এজন্যেই কি রেশমার কাছে যারা আসে তাদের সঙ্গে তিনি এত ভদ্র ব্যবহার করেন? বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় মুড়ি কিনতে যান?

.

১২.

জলিল সাহেব অফিস থেকে একটা সিলিং ফ্যান নিয়ে রাত ন'টার দিকে ফিরলেন। সিলিং ফ্যানের পাখাগুলি একত্র করে বাঁধা। বডিটি বাজারের চটের ব্যাগে লুকানো। জলিল সাহেবের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই সিলিং ফ্যানে কোনো রহস্য আছে।

রহস্য বোঝা গেল রাত দশটার দিকে। ফ্যানটা অফিসের। দারোয়ান সাড়ে তিনশ টাকার বিনিময়ে প্যাক করে দিয়েছে।

সোবাহান সাহেব।

জি।

কাজটা খারাপ হলো নাকি? মনটা খচখচ করছে।

সোবাহান কিছু বলল না।

খারাপ হলেও কিছু করার নাই। গরমে মরব নাকি? তাছাড়া দারোয়ান ব্যাটা আমাকে না পেলে অন্য কাউকে বিক্রি করত।

তা করত।

গরম সহ্য হয় না রে ভাই। এখন ফ্যান খুলে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবেন। এক ঘুমে রাত কাবার। হা হা হা।

সেই রাতেই তিনি ফ্যান লাগাবার মিস্ত্রি নিয়ে এলেন। তার উৎসাহের সীমা রইল। রাত এগারোটার দিকে ফ্যান ঝুলানো হলো। রেগুলেটর বসানো হলো। কিন্তু পাখা ঘুরল না। মিস্ত্রি বিরসমুখে বলল, মটর নষ্ট। কয়েল পুড়ে গেছে। এই পাখা ঘুরবে না।

জলিল সাহেবের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। সোবাহান বলল, ফ্যান ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আসেন।

টাকা আর ফেরত পাব? কী যে বলেন! বেশ্যার ধন সাত ভূতে খায়। আমার টাকাপয়সা হচ্ছে বেশ্যার টাকাপয়সার মতো। সাত ভূতে খাবে। লুটেপুটে খাবে।

নতুন কয়েল লাগালে চলবে বোধহয়।

আরে চলবে না।

জলিল সাহেব বারান্দায় বসে রইলেন। সান্ত্বনার কথা কিছু বলা দরকার বোধহয়। এতগুলি টাকা। সোবাহান চেয়ার টেনে এনে বারান্দায় বসল।

সোবাহান সাহেব।

জি।

সাত ভুতে লুটে খেয়েছে বুঝলেন? দরিদ্র মানুষ টাকাপয়সা যা জমিয়েছি এইভাবে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা জমিয়েছিলাম ব্যাংকে। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্যে একজনকে দিলাম টাকাটা। সে নারিকেল ছোবড়া কিনে এনে ঢাকায় বেচবে, যা লাভ তার চল্লিশ ভাগ তার। ষাট ভাগ আমার। পাঁচ বছর আগের কথা। এখনো সেই ছোবড়া এসে পৌঁছায়নি।

এখন আর এসব চিন্তা করে কী করবেন?

বুড়ো বয়সে খাব কী বলেন? ছেলে নাই যে ছেলে খাওয়াবে। বিষয়সম্পত্তি নাই। ভিক্ষা করতে বলেন?

এত দূরের কথা এখনি ভাবার দরকার কী?

দূর? দূর কোথায় দেখলেন। সাত বছর আছে চাকরি। কেঁদে টেঁদে পড়লে বছরখানিকের এক্সটেনশন হতে পারে। ব্যস।

চলেন চা খেয়ে আসি।

না, চা-টা কিছু খাব না। আপনি যান। আমি ঠিক করেছি দারোয়ান শালাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলব।

খুনটা করবেন কীভাবে?

ফ্যানের ডাণ্ডাটা খুলে কাল অফিসে নিয়ে যাব।

সোবাহান শব্দ করে হেসে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দু'জনে চায়ের দোকানের দিকে যাচ্ছে। রাস্তায় নেমেই সোবাহান হালকা স্বরে বলল, শুধু চা না। আজ চায়ের সাথে দৈ মিষ্টি।

কেন?

বুলুর চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।

তাতে আপনি মিষ্টি খাওয়াবেন কেন? বুলু খাওয়ালে খাওয়াবে। আপনি কে?

ও আমার খুব প্রিয় মানুষ। বড় কষ্ট করেছে।

জলিল সাহেব টেনে টেনে বললেন, বন্ধু, বান্ধবের চাকরিতে এত খুশি হওয়ার কিছু নাই। এখন আপনাকে সে পুছবেও না।

না পুছলেও কিছু যায় আসে না।

বড় বড় কথা বলা সহজ। দুদিন পরে দেখবেন বলতে পারছেন না। দুনিয়াটা নিজের, অন্যের না। বুঝলেন ভাই।

সোবাহান কিছু বলল না। জলিল সাহেব বললেন, বেতন কত দিয়েছে?

এখনো জানে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পায় নাই।

বুঝল কী করে চাকরি হয়েছে?

ঘুষ দিয়েছে সাত হাজার টাকা।

টাকাও গেল, চাকরিও গেল।

জলিল সাহেবকে প্রথম উৎসাহিত হতে দেখা গেল। তিনি চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, বুলু সাহেব এই চাকরি পেলে আমি আপনার গু চেটে খাব। টাকা গেছে যেই পথে চাকরি গেছে সেই পথে। হা হা হা। বুলু সাহেব খুব কাঁচা কাজ করেছে।

পরপর দু'কাপ চা খাওয়ার পর জলিল সাহেব দৈ মিষ্টি খেলেন। তারপর তার ঠান্ডা কিছু খাবার ইচ্ছা হলো। তিনি ইতস্তত করে বললেন, একটা ফান্টা কিনে দুজনে ভাগ করে খাই, কি বলেন?

আমি খাব না। আপনি খান।

আরে ভাই খান না। গরমের মধ্যে ভালোই লাগবে। এই, ঠান্ডা দেখে একটা ফান্টা। দাও।

ফান্টা খেয়ে শেষ করতে করতে বারোটা বেজে গেল। জলিল সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন। পথে নেমেই বললেন, তালের রস খাবেন নাকি? তাড়ি যার নাম। খাঁটি। বাংলাদেশী জিনিস।

জি-না।

চলেন যাই এক গ্লাস করে খেয়ে আসি। এক টাকা করে গ্লাস। বেশি দূর যেতে হবে না।

না, শুয়ে পড়ব।

শুয়ে পড়লে লাভ তো কিছু হবে না। গরমের মধ্যে ঘুমাবেন কীভাবে? চলেন যাই। যাব আর আসব। জিনিসটা ভালো। চেখে দেখেন।

না আজ না। আরেকদিন দেখব।

জলিল সাহেব বিমর্ষ মুখে বাসার দিকে রওনা হলেন। ঘরে ঢুকলেন না, বসে রইলেন বারান্দায়। তার নাকি ফ্যানটার দিকে তাকালেই মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। সোবাহান শুয়ে শুয়ে শুনল, জলিল সাহেব নিজের মনে কথা বলছেন, কষ্টের পয়সা। খেয়ে না-খেয়ে জমানো পয়সা কীভাবে যায়!

সোবাহান গলা উঁচিয়ে ডাকল, কত রাত পর্যন্ত বসে থাকবেন? আসেন শুয়ে পড়ি।

জলিল সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। কতক্ষণ এভাবে বসে কাটাবেন কে জানে।

.

১৩.

রহমান সাহেব আজও অফিসে আসেননি।

সোবাহান চরম ধৈর্যের পরিচয় দিল। লাঞ্চ আওয়ার পর্যন্ত বসে রইল একভাবে। ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল। তবু নড়ল না। বাথরুমে যাওয়া দরকার তাও গেল না। একভাবে বসে থেকে নিজেকে কষ্ট দেওয়া। এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে। সোবাহান। দেখেছে খুব কষ্টের পর একটা কিছু ভালো ঘটে যায়। আজও হয়তো এরকম হবে। হঠাৎ দেখা যাবে লাঞ্চের পর এস. রহমান সাহেব এসে পড়েছেন। সোবাহানকে দেখে বললেন–ও আপনি! আসুন, উপরে চলে আসুন। কাজের ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম দেখা হয়নি। তার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত। আজ যত কাজই থাকুক আপনারটা আগে শেষ করব। কিছু খাবেন? ঠান্ডা কিছু?

বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটল না। লাঞ্চ আওয়ারে সবাই খেতে টেতে গেল। আবার ঘণ্টাখানিক পর ফিরে এল। রহমান সাহেবের দেখা নাই। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি আজ তাকে দেখেও দেখছে না। নাকি ভুলে গেছে? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়— আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি শ্যামলীতে থাকি, সোবাহান। রহমান সাহেবের পি.এর সঙ্গে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল? মনে আছে আমাকে?

মনে থাকার ব্যাপারটি বিচিত্র। কাউকে কাউকে একবার দেখলেই সারা জীবন মনে থাকে। আবার এমন লোকও আছে যাদের সঙ্গে বারবার দেখা হয় তবু তাদের কথা মনে থাকে না। প্রতিবারই তাদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করতে হয়। যেমন বুলু। বুলু বলে, দেশের বাড়িতে পাঁচ-সাত দিন থেকে ঢাকায় এলে তার মামা নাকি তাকে চিনতে পারেন না। বুলুকে মাথা নিচু করে বলতে হয়–আমি বুলবুল। বুলুর ধারণা সব মানুষের চেহারার সঙ্গে কারও-না-কারও মিল থাকে। পরিচিত কাউকে সে মনে করিয়ে দেয়। এ জন্যেই কোনো মানুষকেই কখনো পুরোপুরি অচেনা লাগে না। বুলুকে লাগে। সে নাকি কাউকে মনে করিয়ে দেয় না।

সোবাহান সাহেব!

সোবাহান চমকে তাকাল। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি তাকে ডাকছে। নাম তাহলে মনে। আছে। সোবাহান এগিয়ে গেল। পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে। হাঁটতে হচ্ছে খুড়িয়ে খুড়িয়ে। মেয়েটি হাসিমুখে তাই দেখছে।

আমাকে কিছু বলছেন?

হ্যাঁ। রহমান সাহেব টেলিফোন করেছেন তিনি সাড়ে তিনটার দিকে আসবেন। আপনি কি বসবেন এতক্ষণ?

হ্যাঁ বসব।

অফিস ইউনিয়নের সঙ্গে তার একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।

লাগুক যতক্ষণ লাগে। আমি বসে থাকব। বাইরে রোদে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে এখানে বসে থাকায় আরাম আছে।

মেয়েটি হাসিমুখে বলল, ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিংয়ের পর স্যারের মেজাজ খুব খারাপ থাকে। আপনার যাওয়া উচিত যখন তার মেজাজ থাকে ভালো।

মেজাজের ওপর তো চাকরি হবে না। চাকরি হওয়া না-হওয়ায় মেজাজটা কোনো ডিটারমিনিং ফেক্টর নয়।

যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় ডিটারমিনিং ফেক্টরগুলি আপনার পক্ষে।

আমি এখনো জানি না। একজন ভদ্রমহিলা আমাকে একটা চিঠি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। ভদ্রমহিলার ধারণা চিঠি দেখানো মাত্র আমার চাকরি হবে।

দেখিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কী বললেন চিঠি পড়ে।

পরে দেখা করতে বললেন।

মেয়েটি ইতস্তত করে বলল, কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে জানেন?

খামের চিঠি, আমি পড়ে দেখিনি।

আপনার পায়ের ঝিঁঝি এখনো কমে নাই?

জি-না। কমতে অনেক সময় লাগছে।

শেষ প্রশ্নটিতে সোবাহান বেশ অবাক হলো।

আপনি তো সারা দুপুর কিছু খাননি? আমাদের এখানকার স্টাফদের জন্যে ক্যান্টিন আছে। দুপুরে রুটি-গোশত পাওয়া যায়। আপনি ইচ্ছে করলে সেখানে খেতে পারেন। বেশ সস্তা।

আমি তো স্টাফ না।

একদিন হয়তো হবেন। আসেন আমার সঙ্গে, আমি বলে দিচ্ছি। আমিও না হয় আপনার সঙ্গে চা খাব এক কাপ।

সোবাহানের বুক শুকিয়ে গেল। পকেটে টাকা আছে ছ'টি। রুটি-গোশত খেতে কত লাগবে কে জানে। একটি মেয়ের সামনে কখনো বলা যায় না–ভাই, আমার তো দু'টি টাকা কম পড়েছে। কাল এসে দিয়ে যাব। কিছু মনে করবেন না।

না খেয়েই বসে থাকবেন, না যাবেন?

আজ আর অপেক্ষা করব না। বাসায় চলে যাব। কাল পরশু একবার আসব।

সোবাহান মেয়েটিকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

বাসে করে শ্যামলী এসে পৌঁছাতে লাগল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ফাঁকা বাস। ফাঁকা বাসে উঠে বসলে আপনাতেই মন ভালো হয়ে যায়। সিগারেট ধরিয়ে মুখ ভর্তি করে ধোয়া ছাড়তে ইচ্ছা করে।

মন ভালো ভাবটি বাসায় পৌঁছেও বজায় রইল। সোবাহান দেখল চারটি চিঠি এসেছে তার নামে। একটি খুলে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। খামের আকৃতি ও রঙ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা রিগ্রেট লেটার। উপরের ঠিকানাটা যেহেতু বাংলায় ভেতরের চিঠিটিও বাংলাতেই লেখা। লেখার ধরনটাও বলে দেওয়া যায়। জনাব, আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্তমানে আমাদের সংস্থায় কোনো কর্মখালি নাই। ভবিষ্যতে কোনো শূন্য পদ সৃষ্টি হইলে আপনার সহিত যোগাযোগ করা হইবে। আর এই বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

ভেতরের লেখা কী হবে জেনেই এই খামটিই সোবাহান আগে খুলল। যা ভাবা গিয়েছে তা নয়। চোখ দান করার জন্যে অনুরোধ করে লেখা। ছাপানো চিঠি। শেষ লাইনে লেখা– মৃত্যুর পরও আপনার চোখ অনেকদিন বেঁচে থাকবে। এর চেয়ে চমকার ব্যাপার আর কী হতে পারে?

মৃত্যুর পর চোখ বেঁচে থাকার মধ্যে চমকারের কী আছে? যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা অনুভব করার মানুষটি কোথায়? সোবহান চিঠিটি ড্রয়ারে ভরে রাখল। ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি দিয়েছে সেই কারণেই দুটি চোখ দিয়ে দেওয়া দরকার। মৃত্যুর পর চোখ বেঁচে থাকবে সে-জন্যে নয়।

দেশ থেকে এসেছে দু'টি চিঠি। একটি ভাবির, অন্যটি ফরিদ আলির। এ চিঠি দুটি রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আরাম করে পড়তে হবে।

চতুর্থ চিঠিটির হাতের লেখা অপরিচিত। কে হতে পারে? পুরনো বন্ধুদের কেউ? তারাপদ নয় তো? আইএসসি পাশ করে কীভাবে চলে গেল জার্মানি, তারপর আর। খোঁজখবর নেই। হয়তো দেশে ফিরে ঠিকানা বের করে লিখেছে। তারাপদের কথা খুব মনে হয়।

চিঠি তারাপদের নয়। চিঠিটি মিলির লেখা। বিরাট এক কাগজে চার-পাঁচ লাইনের ছোট্ট চিঠি।

সোবাহান ভাই,

আম্মা চাকরির জন্যে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করেছেন? আম্মা তা জানতে চান। এখনো দেখা না করে থাকলে খুব অন্যায় করেছেন। দেখা করবেন, ফলাফল জানাবেন।

মিলি

সোবাহান হাতমুখ ধুয়ে অবেলায় হোটেলে খেতে গেল। এখন ভাত খাওয়ার কোনো অর্থ। হয় না। গরম গরম সিঙ্গারা ভাজা হচ্ছে। দুটি সিঙ্গারা এক কাপ চা খেয়ে বাসায় ফিরে দেখে, মনসুর সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে আছেন।

স্লামালিকুম। আপনার কি শরীর খারাপ?

না ভাই, শরীর ঠিকই আছে। আপনারা আছেন কেমন?

ভালোই আছি।

ফ্যান কিনেছেন দেখলাম। ভালোই করেছেন। যা গরম। বাইরে একটা চেয়ার এনে বসেন না গল্প করি।

সোবাহান চেয়ার এনে বসল। মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, আজই আপনার ভাইয়ের একটি চিঠি পেয়েছি। বিয়ের ব্যাপার আষাঢ় মাসের মধ্যে সেরে ফেলতে চান। আমাদের আপত্তি আছে কি না জানতে চেয়েছেন।

সোবাহান কিছুই বলল না।

আমাদের তরফ থেকে কোনোই আপত্তি নাই। শুভ কাজ। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। আপনাকে জানিয়ে দিলাম। আপনার ভাইকেও আজকালের মধ্যে চিঠি লিখব।

ভদ্রলোক পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন।

নেন, সিগারেট নেন। যূথিকে চা দিতে বলেছিলাম। আপনার জন্যেও দিতে বলি। আর ভাই শোনেন, ওকে নিয়ে যদি বাইরে টাইরে যেতে চান–চিড়িয়াখানা পার্ক এসব। আর কী, তাহলে যাবেন। অসুবিধা কিছু নাই। বিয়ের আগে চেনা থাকা দরকার। বৃথি! যূথি!

যূথি বের হয় এল। সোবাহানকে দেখে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাও, তোমার সোবাহান ভাইকে চা দাও।

মেয়েটির মাথা আরও নিচু হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল উল্টোদিকে। মনসুর সাহেব বললেন, আপনি আর জলিল সাহেব পরশু রাতে আমার এখানে চারটা ডালভাত খাবেন।

সোবাহান নিচুস্বরে বলল, তার কোনো দরকার নেই।

আছে দরকার আছে। রোজ রোজ হোটেলে খান। মাঝে মধ্যে ঘরের খাওয়াদাওয়া দরকার। যূথি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? চা দিতে বললাম না? নাকি কানে আজকাল শুনতে পাও না।

যুঁথি দ্রুত ঘরের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কপালের সঙ্গে ধাক্কা খেল। মনসুর সাহেব অস্ফুট স্বরে বললেন, সংয়ের মতো চলাফেরা, অসহ্য!

মনসুর সাহেবের মন ভালো নেই। তাঁর স্ত্রী আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশি বিরক্ত করছে।

.

১৪.

বুলু চিঁচি করে বলল, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

বুলুর মামা হুদা সাহেব বললেন, হাসপাতাল কেন?

আমার অবস্থা সুবিধার না।

তুই বুঝলি কী করে?

বোঝা যায়, অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারের আগে টের পায় রোগী।

হুদা সাহেব তাকিয়ে রইলেন বুলুর দিকে। গতকাল থেকে বুলু ফটফট করে কথা বলছে। আগে তার ছায়া দেখলে বুলুর দম বন্ধ হয়ে আসত। হ্যাঁ কিংবা না বলতেই তিনবার বিষম খেত। এখন দিব্যি কথাবার্তা বলছে। কথা বলবার ভঙ্গি এরকম যেন ইয়ার দোস্তের সঙ্গে আলাপ করছে। হুদা সাহেব বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। কঠিন স্বরে বললেন, চুপচাপ শুয়ে থাক।

শুয়েই তো আছি। বসে আছি নাকি?

ফটফট করছিস কেন?

ফটফট করছি না। হাসপাতালে ভর্তি করতে বলছি। যত তাড়াতাড়ি সেটা করা যায় ততই ভালো। দি আরলিয়ার দি বেটার।

বুলুর গালে একটা চড় বসাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা বহু কষ্টে সামলে হুদা সাহেব পাশের। ঘরে গেলেন। নটা বেজে গেছে, অফিস যেতে হবে। পাগলামি শুনবার সময় নেই। বুলু ডাকল, মামা! ও মামা!

কী?

চিন্তা করে দেখলাম আপনার পক্ষে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব না। চেহারা পালোয়ানের মতো হলেও হাসপাতালের লোকজন বডিবিল্ডারদের পাত্তা দেয় না। আপনি বরং আমার বন্ধুদের কাউকে খবর দেন।

হুদা সাহেব এই প্রথমবার শান্তস্বরে কথা বললেন। অবিশ্বাস্য রকমের নরম সুরে বললেন, অফিস থেকে এসে দেখব কী ব্যাপার। জয়নাল ডাক্তারকে বলে যাব, দুপুরে একবার যেন দেখে যায়।

হুদা সাহেব অফিস গেলেন চিন্তিত মুখে।

বুলু আর কোনো সাড়াশব্দ করল না। বুলুর মামি দুপুরে এক বাটি চিড়ার পানি এনে খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। কয়েক ঢোক গিলেই বুলু বমি করল।

মামি, তোমার শাড়ি বোধহয় নষ্ট করে দিলাম।

মামি কিছু বললেন না। তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো। এই ছেলেটির প্রতি তার খুব মমতা।

মামি, বাথরুমে যাওয়া দরকার। ধরতে পারবে?

পারব।

তোমার যে স্বাস্থ্য, নিজেকেই সামলাতে পার না।

শরীরটা বেশি খারাপ বুলু?

হুঁ।

তোর মামার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিস নারে বাবা। লোকটা রাগলে মুশকিল। আমারও মুশকিল।

অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো মামি। চাকরি শুরু করলেই তোমাকে নিয়ে যাব আমার বাসায়। মামাকে টিট করে দেব। থাক ব্যাটা একা একা বাসায়।

ছিঃ, এইসব কী ধরনের কথা! হাজার হলেও তো মামা।

তাও ঠিক। মামা। মায়ের ভাই। মাদারস ব্রাদার।

তোর ধারণাও ঠিক না–তোকে একেবারে যে অপছন্দ করে তাও না। পছন্দও করে।

বলো কী?

গত রাতে একবার জিজ্ঞেস করল, তুই ভাত খেয়েছিস কি না।

বলো কী? এত বড় সৌভাগ্য আমার! শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে মামী। এখন তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বাথরুমে নাও। বিছানা নষ্ট করে দেব।

হুদা সাহেব দুপুরবেলাতে ফিরে এলেন। বুলু পড়ে আছে মরার মতো। ডাকলে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হুদা সাহেব দুপুরে কিছুই খেলেন না। ছুটাছুটি শুরু করে দিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সামান্য জুনিয়ার ক্লার্ক হয়েও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বেলা চারটার সময় তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি সিট জোগাড় করে ফেললেন। হাসপাতালের রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান রোগী দেখে চমকে উঠে বললেন, এত খারাপ অবস্থা! রোগী তো যে-কোনো সময় চলে যাবে। আগে আপনারা করেছেন কী?

হুদা সাহেব হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। এটি হাসপাতালের একটি পরিচিত দৃশ্য। রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানের কোনো ভাবান্তর হলো না। তিনি একটি সিগারেট ধরিয়ে শান্তস্বরে বললেন, বাইরে চলে যান। কান্নাকাটি যা করার বাইরে গিয়ে করবেন। এখানে সিন ক্রিয়েট করবেন না। এতে কাজের ক্ষতি হয়।

.

১৫.

রিসিপশনিস্ট মেয়েটিকে আজ অপূর্ব লাগছে। সবুজ রঙের শাড়িতে কাউকে এত মানায় নাকি?

সোবাহান সাহেব, আপনি কেমন আছেন?

ভালোই আছি।

বসুন, আজ স্যারের সঙ্গে দেখা হবে।

কেমন করে বুঝলেন?

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল।

আমি স্যারকে আপনার কথা বলে রেখেছি।

কী বলেছেন?

বলেছি একজন ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছেন। স্যার বললেন–এগারোটার সময় তাঁর কাছে আপনাকে পাঠাতে।

থ্যাংক ইউ।

সোবাহান সাহেব, আপনি বসুন।

সোবাহান বসল না, মেয়েটির ডেস্কের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

মনে হচ্ছে আপনার কিছু একটা হবে।

এরকম মনে হচ্ছে কেন?

স্যার নাম বলতেই আপনাকে চিনতে পারলেন। আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেটি আনতে বললেন। চা খাবেন?

না।

না কেন, খান। আপনি বসুন, আমি চা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। গেস্টদের চা দেওয়ার আমাদের যে নিয়ম ছিল সেটি এখন আর নেই। চা আনতে হবে ক্যানটিন থেকে।

ঝামেলা করার দরকার নেই।

ঝামেলা কিছু না।

সোবাহান বসে রইল চুপচাপ। আজই কি সেই বিশেষ দিন? বিশ্বাস হতে চায় না। কোনো কিছুতেই এখন আর বিশ্বাস আসে না। চার বছর কাটল চাকরি ছাড়া। চার বছর খুব লম্বা সময়। এর মধ্যে এক বছর কেটেছে প্রাইভেট টুশনি করে। সেই ছেলে মেট্রিক পরীক্ষায় তিন সাবজেক্ট ফেল করায় টুশনি গেল।

বুলু কোত্থেকে প্রুফ রিডিংয়ের চাকরি জোগাড় করে আনল। তার খুব উৎসাহ। বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে রোজগার। মূলধন হচ্ছে–একটা লাল শিস কলম। গভীর রাত পর্যন্ত দু'জনে মিলে প্রুফ দেখাদেখি। সে কাজও বাদ দিতে হলো। পয়সা যা পাওয়া যায়। তাতে পোয় না।

এরমধ্যে করিম প্রাইজবন্ডের ব্যবসার এক খবর নিয়ে এল। পুরনো প্রাইজবন্ড কিনে মিলিয়ে দেখা প্রাইজ আছে কি না। অনেকেই না দেখে প্রাইজবন্ড বিক্রি করে দেয়। একটা পঞ্চাশ হাজার লাগাতে পারলেই ব্যবসার ক্যাপিটাল চলে আসবে হাতে। করিমের। খাতায় গত দশ বছরের প্রাইজ পাওয়া বন্ডের নাম্বার লেখা আছে। কাজ হচ্ছে বন্ড কেনা। নাম্বার মিলিয়ে দেখা প্রাইজ আছে কি না। না থাকল বিক্রি করে দেওয়া।

করিম চোখের সামনে পাঁচ হাজার টাকার একটা প্রাইজ বাধিয়ে ফেলল। কী তুমুল উত্তেজনা। তারা তিনজন মিলে মানিকগঞ্জ, টঙ্গি, জয়দেবপুর হেন জায়গা নেই যে। যায়নি। বুলু এবং সোবাহান বেশিদিন টিকে থাকতে পারল না। করিম ঝুলেই রইল।

অনেকদিন দেখা হয় না করিমের সাথে। চিটাগাং-এ কোন এক ফার্মে নাকি একটা চাকরি হয়েছে। এখনো প্রাইজবন্ডের সন্ধানে ঘোরে কি না কে জানে।

বড় কষ্ট গিয়েছে জীবনের ওপর। বড়ই কষ্ট। কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে? সবচেয়ে অস্বস্তি লাগে ছুটির দিনে। সবার ছুটি, তাদের ছুটি নেই। ছুটি আসে কাজের সঙ্গে। কাজ নেই ছুটিও নেই।

সোবাহান সাহেব।

জি।

যান, স্যারের কাছে যান। এগারোটা বাজে।

এস. রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, বসুন বসুন। শুনলাম আপনি বেশ কয়েকবার এসেছেন–দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।

জি স্যার।

দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকি। নানান ঝামেলা। আমি খুবই লজ্জিত–আপনার এতটা ট্রাল হলো।

কোনো ট্রাবল না স্যার। এমনিতে তো ঘরেই বসে থাকতাম।

চা খাবেন?

জি-না। এক কাপ খেয়েছি।

খান, আরেক কাপ খান। আমার সঙ্গে খান।

রহমান সাহেব বেল টিপলেন। চায়ের কথা বললেন। একটা চুরুট ধরালেন। ধরিয়ে আবার নিভিয়েও ফেললেন।

সোবাহান সাহেব।

জি স্যার।

ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে আমরা এবজর্ভ করতে পারছি না।

সোবাহান তাকিয়ে রইল।

ফার্মের অবস্থা ভালো নয়। গত বছর আমরা তিন লক্ষ টাকা লস দিয়েছি। ইউনিয়নের চাপে পড়ে বিশ পারসেন্ট হাউসরেন্ট দিতে হয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে না ফার্মের কী ক্ষতিটা ওরা করছে। ফার্মের উন্নতি মানেই ওদের উন্নতি, এই সহজ সত্য ওরা বোঝে না। শুধু আদায় আর আদায়। ফার্মই যদি না থাকে আদায় করবে কী? নিন চা খান। চিনি হয়েছে?

জি হয়েছে।

আগামী বছর জুন-জুলাই মাসে একবার খোঁজ করবেন। আমি খুব চেষ্টা করব কিছু একটা করতে।

জুন-জুলাই মাসে?

হ্যাঁ। এর আগে যদি কিছু হয় আপনাকে জানানো হবে। আপনার দরখাস্তটা ফাইলে তুলে রাখব।

সোবাহান চা শেষ করে শীতল গলায় বলল, এই কথাটি বলতে আপনার এত দিন লাগল কেন?

তার মানে?

প্রথম দিনই তো আপনি আমাকে এটা বলতে পারতেন। পারতেন না?

রহমান সাহেব চশমা খুলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন। সহজভাবেই কথাটা নিচ্ছেন তা বোঝা গেল না।

সোবাহান যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল। রহমান সাহেব বললেন, আপনি এখন যেতে পারেন।

কিছু মনে করবেন না, আমি এই কথাটির জবাব আপনার কাছ থেকে জেনে তারপর যাব বলে ঠিক করেছি।

কী জানতে চান?

হবে না এই কথাটি বলতে আপনার এত সময় লাগল কেন?

আপনি একজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। এ ধরনের কাউকে এ ফার্মে আমি কাজ দেব না।

আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

রহমান সাহেব উঁচুগলায় বললেন, নাউ ইয়ংম্যান, প্লিজ গেট আউট।

আমি তো আপনাকে বলেছি আমার প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে।

রহমান সাহেব জ কুঁচকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। কেউ এরকমভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। সোবাহান ঠান্ডা স্বরে বলল, আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে জবাব জেনে তারপর যাব। তার আগে যাব না।

বসে থাকবেন?

হ্যাঁ।

সারা দিন বসে থাকবেন?

হ্যাঁ। বসে থেকে আমার অভ্যাস আছে।

রহমান সাহেব প্রথমবারের মতো হাসলেন। চুরুট ধরালেন। এবং হালকা সুরে বললেন, ঠিক আছে বলছি আপনাকে। কারণ না শুনে যখন যাবেন না তখন তো কারণটা। আপনাকে বলতেই হবে। এক মিনিট বসুন, আমি আসছি। চা খাবেন আরেক কাপ?

না।

বেশ, তাহলে বসে থাকুন। এক্ষুনি আসছি। এক মিনিটের বেশি লাগবে না।

রহমান সাহেব ফিরে এলেন না। দু’জন দারোয়ান এসে সোবাহানের ঘাড় চেপে ধরল। ওদের গায়ে তেমন জোর নেই, তবু ওরা সোবাহানকে প্রায় শূন্যে ভাসিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল। একজন পেছন থেকে ডান হাত মুচড়ে ধরে আছে। অন্যজন বাঁ হাত এবং চুলের মুঠি ধরে আছে।

রিসিপশনের মেয়েটি তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। তার চোখ পড়ল সোবাহানের চোখে। সোবাহান চোখ ফিরিয়ে নিল না, তাকিয়েই থাকল। মেয়েটি যেন বড় বেশি অবাক হয়েছে। এত অবাক হওয়ার কী আছে?

.

জলিল সাহেব রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সোবাহানকে দেখে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন? কী হয়েছে আপনার?

কিছু হয় নাই।

রাত দেড়টা বাজে খেয়াল আছে? এরকম লাগছে কেন আপনাকে? কী হয়েছে?

কিছু হয় নাই।

মনসুর সাহেবের বাসায় খাওয়ার দাওয়াত ছিল মনে নাই আপনার? আমরা চিন্তায় অস্থির। আপনার খাওয়া ঘরে এনে ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এই যে ভাই, এত মন খারাপ লাগছে কেন? কোথায় ছিলেন?

জলিল সাহেব সোবাহানের হাত ধরলেন।

কী যে কাণ্ড করেন। আমি ভাবলাম একসিডেন্ট টেকসিডেন্ট হলো কি না!

সোবাহান কিছুই বলল না। জলিল সাহেব নিজের মনেই কথা বলে যেতে লাগলেন–যূথি মেয়েটা অনেক রান্নাবান্না করেছিল। আপনি না আসায় মেয়েটার মনটা ছোট হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে যে আপনার বিয়ে হচ্ছে তা তো ভাই জানতাম না। মনসুর সাহেবের কাছে আজ শুনলাম। বড় শান্ত মেয়ে। সুখ পাবেন। সুখটাই আসল। আপনার

কী হয়েছে বলেন দেখি?

কিছু হয় নাই।

সার্টটা ছেঁড়া কেন?

জানি না কেন।

আপনার বন্ধু বুলু, তার মামা এসেছিলেন বিকেলবেলা। ওর নাকি অসুখ, মিটফোর্ডে ভর্তি হয়েছে। আপনাকে যেতে বললেন। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আপনার জন্যে বসে ছিলেন।

অসুখ কি খুব বেশি?

হ্যাঁ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে যাবেন।

হাসপাতালে কবে ভর্তি করিয়েছে?

পরশু দিন।

ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে মনসুর সাহেব উঠে এলেন। যূথি এল পিছু পিছু। খাবারদাবার নিয়ে গেল, গরম করে আনবে। সোবাহান বড় লজ্জায় পড়ল। মেয়েটি মনে হলো তাকে লক্ষ করছে কৌতূহলী চোখে। মনসুর সাহেব বললেন, কোথায় ছিলেন এত রাত পর্যন্ত?

সোবাহান চুপ করে রইল।

হাত-মুখ ধুয়ে আমার ঘরে চলেন। ওখানেই খাবেন। আবার এখানে টানাটানি করা ঝামেলা।

ভেতরের বারান্দায় টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি মাথা নিচু করে এটা। ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। সোবাহান ইতস্তত করে বলল, তুমি খেয়েছ?

যুঁথি মাথা নাড়ল। সে খায়নি।

বসো। তুমিও খাও।

আপনি খান। আমি পরে খাব।

বড় লজ্জা লাগছে সোবাহানের। মেয়েটি তাকে দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বারান্দায় আর কেউ নেই। মনসুর সাহেব বোধহয় ইচ্ছা করেই আসেননি। সোবাহান নিচুগলায় বলল, তোমার আপা কোথায়?

আপা ঘুমাচ্ছে। উনার শরীর খারাপ। আপনি তো কিছুই খেলেন না।

আমার ক্ষিধে নেই।

হাত-মুখ ধোয়ার সময় মেয়েটি হঠাৎ বলল, আপনি রোজ রাতে এত দেরি করে ফিরেন কেন?

সোবাহান অবাক হয়ে তাকাল। থেমে থেমে বলল, চাকরির ধান্ধায় থাকি। নানান জায়গায় যাই।
পান খাবেন? পান দেব?
না, আমি পান খাই না।
সোবাহান হাত-মুখ ধুয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। যাওয়ার আগে কিছু বলা দরকার। রান্না চমৎকার হয়েছে এই জাতীয় কিছু। তেমন কোনো কথাই মনে আসছে না। মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে কি? সোবাহান আচমকা বলে ফেলল, মাঝে মাঝে অনেক রাতে তোমাদের এখানে কে কাঁদে?

মেয়েটি শান্তস্বরে বলল, আমি। আপনাদের ওঘর থেকে শোনা যায় আমি বুঝতে পারিনি।

শোনা গেলে কাঁদতে না?

যূথি জবাব দিল না। সোবাহান একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, কেন কাঁদ? জিজ্ঞেস করা হলো না। কত রকম দুঃখ আছে মানুষের। সেসব জানতে চাওয়া ঠিক না।

যূথি, যাই। কষ্ট দিলাম তোমাকে। যাও খেতে, খেয়ে নাও।

১৬-২০. বুলুর অবস্থা এতটা খারাপ

বুলুর অবস্থা এতটা খারাপ হয়েছে সোবাহান বুঝতে পারেনি। সে অবাক হয়ে ডাকল, এই বুলু! এই!

বুলু ঘোলা চোখে তাকাল।

এ কী অবস্থা তোর?

অবস্থা কেরাসিন। হালুয়া টাইট।

হয়েছে কী?

জণ্ডিস।

জণ্ডিসে এরকম হয় নাকি?

অভাগাদের হয়।

বুলু চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঘুমিয়ে পড়ল বোধহয়। সোবাহান বেডের পাশে রাখা টুলে বসে রইল চুপচাপ। এখন ভিজিটিং আওয়ার নয়। তবু অনেক লোকজন চারদিকে ঘুরঘুর করছে। কোণার দিকে একটি রোগীকে ঘিরে আছে ছ'সাতজনের একটি দল। দু'টি অল্পবয়স্ক মেয়ে আছে। ওরা খিলখিল করে হেসে উঠছে বারবার। বুলুর সাড়াশব্দ নেই।

এই বুলু, এই।

কী?

জেগে ছিলি নাকি?

হুঁ। রেস্ট নিচ্ছিলাম। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারি না।

রেশমা এসেছিল?

হ্যাঁ। কাল সারা দিনই ছিল।

আজ আসবে না?

কী জানি। কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। লাগছে কেমন তোর?

ভালোই। কাল রাতে তোর বড়ভাইকে স্বপ্নে দেখলাম।

সোবাহান বিস্মিত হলো। বুলু টেনে টেনে বলল, দেখলাম যেন তোর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। তোর ভাই গাছের নিচে বসে শান্তির কথা টথা বলছে। দাড়ি চুল সব মিলিয়ে তাকে রবীন্দ্রনাথের মতো লাগছে।

সোবাহান চুপ করে রইল। বুলু ফিসফিস করে বলল, শান্তি ব্যাপারটা কী তোর ভাইকে জিজ্ঞেস করিস তো?

তুই নিজেই জিজ্ঞেস করিস।

করব। আমি করব। ইন কেস আমি যদি না থাকি, যদি ফুটটুস হয়ে যাই তাহলে তুই জিজ্ঞেস করবি এবং বলবি, লম্বা লম্বা বাত নেহি ছারেগা। ইয়ে গম নেহি।

বুলু নেতিয়ে পড়ল। সোবাহান বলল, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

ঘাবড়ালাম কোথায়?

একজন অল্পবয়স্ক ইন্টার্নি ডাক্তার এসে গম্ভীর গলায় বলল, এখানে আপনি কী করছেন? এটা কি ভিজিট করার সময়? এখন যান, চারটার সময় আসবেন।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত এ ডাক্তারটির কথা কেউ শোনে না। সে হয়তো ভেবেছিল সোবাহান উঠতে চাইবে না। তাকে বিনা তর্কে উঠে দাঁড়াতে দেখে তার হয়তো অস্বস্তি লাগল। সে নরম স্বরে বলল, রোগী আপনার কে?

আমার বন্ধু।

ঠিক আছে চার-পাঁচ মিনিট কথা বলে চলে যান। রোগীকে এখন বিরক্ত করা ঠিক। রেস্ট দরকার।

ওর এ অবস্থা হলো কেন?

খারাপ ধরনের জন্ডিস। লিভার ড্যামেজড হয়েছে। শরীরের সবচেয়ে বড় অর্গানটাই হচ্ছে লিভার। পাঁচ সের ওজন। সেটা ড্যামেজড হলে কী অবস্থা হয় বুঝতেই পারেন।

ডাক্তারটি কোনার দিকের বেডের দিকে চলে গেল। অল্পবয়েসী মেয়ে দুটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে।

বুলু।

উ।

কেমন লাগছে?

ভালো না।

বেশি খারাপ লাগছে?

হুঁ। তুই এখন যা।

কথা বলার দরকার নাই। তুই শুয়ে থাক চুপচাপ। আমি থাকি আরও কিছুক্ষণ।

শুধু শুধু বসে থেকে কী করবি?

যাবই বা কোথায়?

বুলু চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। একটি নার্স এসে দুধ পাউরুটি দিয়ে গেল। বুলু ক্লান্তস্বরে বলল–সোবাহান, তুই যা। তোকে দেখে বিরক্ত লাগছে। বিকেলে আসিস। আমি ঘুমাব।

তোকে ঘুমাতে নিষেধ করছি?

যেতে বলছি যা। বাজে তর্ক ভালো লাগে না।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল। বুলু থেমে থেমে বলল, বিকেলে আসার সময় এক কাজ করিস, তোর বায়োডাটা, টেস্টিমনিয়েল এইসব নিয়ে আসিস। নাম সই করে একটা ফুলস্কেপ সাদা কাগজ আনিস।

কেন?

আনতে বলছি নিয়ে আসবি। এত কথা কিসের?

বুলু চোখ বন্ধ করে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। একটি মাছি ভনভন করে তাকে বড় বিরক্ত করছে। সে চাঁদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

.

গুলিস্তানের দিকে রিকশা-টিকশা কিছু যাচ্ছে না। একটা মিছিল বেরিয়েছে। কিসের মিছিল কেউ জানে না। জানার তেমন প্রয়োজনও অবশ্যি নেই। মিছিল হচ্ছে মিছিল। যা দেখামাত্র সেখানে সামিল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সোবাহান নওয়াবপুর রোডের কাছে মিছিলের দেখা পেল। মাঝারি ধরনের মিছিল। প্রচুর লাল নিশান দেখে মনে হয় শ্রমিকদের কোনো ব্যাপার-ট্যাপার হবে। মিছিলের সঙ্গে হাঁটার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সবসময় মনে হয় উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও যাওয়া হচ্ছে।

তাছাড়া চোখের সামনে মিছিলের চরিত্র বদলাতে থাকে, তাও দেখতে ভালো লাগে। যত সময় যায় ততই মিছিলের মানুষগুলি রেগে উঠতে থাকে। একটা সময় আসে যখন শুধু আগুনের কথা মনে হয়। চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এটাই সবচেয়ে চমৎকার সময়। তখন পাশের মানুষটিকেও মনে হয় কতদিনের বন্ধু।

কিন্তু আজকের মিছিল জমছে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। প্রধান কারণ সম্ভবত মিছিলের সঙ্গে পুলিশ-গাড়ি নেই। লাল রঙের পতাকাগুলি কড়া রোদে হলুদ হলুদ দেখাতে লাগল। এ মিছিলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সোবাহান মিছিল ফেলে রেখে বাসায় চলে এল।

আজ দুপুরেও খাওয়া হয়নি। এ অভ্যাসটা সত্যি সত্যি করে ফেলতে পারলে মন্দ হয় না। খাওয়াদাওয়ার ঝামেলাটা তাহলে থাকে না।

সোবাহান বালতি হাতে গোসল সারতে গেল। কাছেই একটা টিউবওয়েল আছে। প্রচণ্ড গরমেও বরফের মতো ঠান্ডা পানি আসে সেখানে। ঝি-শ্রেণীর মেয়েরা এই সময়ে দল বেঁধে গোসল করে। দল বেঁধে ঝগড়া করে। দল বেঁধে হাসে। এ সময়টা ওদের। নিজস্ব।

গোসলের পর ক্ষিধে পেয়ে গেল। ভাতের ক্ষিধে। একটি পরিষ্কার থালায় জুই ফুলের মতো কিছু ভাত। চারপাশে ছোট ছোট বাটি। একটা বড় কাঁচের গ্লাসে বরফের মতো ঠান্ডা পানি। এরকম একটা ছবি ভাসতে লাগল চোখের সামনে। ক্ষিধে পেলেই এরকম একটা ছবি ভাসে। মিলিদের বাসার ছবি। ওদের ওখানে চলে গেলে কেমন হয়?

মিলির বর কি এসেছে বিলেত থেকে? কবে যেন আসার কথা? এ মাসেই তো আসার কথা।

একসময় বিলেত যেতে ইচ্ছা করত। কম বয়সে কত অদ্ভুত সব স্বপ্ন থাকে। পৃথিবী থাকে হাতের মুঠোর মধ্যে। তখন মনে হয় খালাশির চাকরি নিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো। জায়গায় চলে যাওয়া যায়। মহানন্দে রবিনসন ক্রুশোর মতো নির্জন দ্বীপে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বনের ভেতর সারা দিন ঘুরে বেড়ানো, সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রতীরে বালির বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা। চমৎকার সব জীবন।

সোবাহান ভেজা গায়ে ঘরে ফিরে দেখে, ভাবির আরেকটি চিঠি এসেছে। আগের চিঠিটির জবাব দেওয়া হয়নি। এখন কেন জানি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। ভাবির এবারের চিঠিটি সংক্ষিপ্ত

কেন তুমি চিঠি লিখিতেছ না? তোমার ভাইয়ের চিঠির জবাব এখনো দাও নাই। তোমার ভাই খুব চিন্তিত। তিনি অবশ্যি এখন তাঁর নামাজঘর নিয়া আছেন। বেশির ভাগ রাত্রে সেইখানেই থাকেন। অনেক দূর দূরান্ত হইতে তাহার কাছে লোকজন আসে। আমার ভালো লাগে না। ভাই, তুমি একবার আসো। যূথির দুলাভাই তোমার ভাইয়ের কাছে একটি দীর্ঘ

সূচিপত্র

পত্র দিয়াছেন। সেই সঙ্গে যূথির একটি ছবি। মেয়েটির চেহারা খুব মায়াবতী। আমার পছন্দ হইয়াছে। তোমার নিজের মুখ হইতে এই মেয়েটির সম্পর্কে আরও কথা জানিতে ইচ্ছা করে। তুমি ভাই, চিঠি পাওয়া মাত্র একদিনের জন্যে হইলেও আসিবে।

.

১৭.

মনসুর সাহেব আজ দু'টি খবর পেয়েছেন। প্রথম খবর হচ্ছে তাকে বদলি করা হয়েছে কুষ্টিয়ায়। প্রমোশনের বদলি। এখন থেকে বাড়িতে টেলিফোন থাকবে। সরকারি গাড়ি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় খবরটি এরচেয়ে ভালো। সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন তার অবদানের কথা মনে রেখে তাঁকে এই পরিত্যক্ত বাড়িতে বসবাসের অধিকার দিয়েছেন। সহজ শর্তে সরকারের কাছ থেকে বাড়িটি তিনি কিনে নিতে পারবেন। তবে বাড়ির জন্যে প্রয়োজন এমন কোনো সংস্কারের কাজ সরকার করতে পারবেন না। ইত্যাদি।

মনসুর সাহেব অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেন। বাড়ির ব্যাপারে বিশ রাকাত নফল নামাজ মানত ছিল। মানত পূরণ করা দরকার সবার আগে।

অনেক দিন পর আজ হাঁটতে তার কষ্ট হলো না। পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ করে কমে গেছে। হাঁটতেও আজ বড় আনন্দ লাগছে। বাড়ির কাজে এখন ঠিকমতো হাত দিতে হবে। দোতলা কমপ্লিট করে ভাড়া দিতে হবে। সাবলেট দিয়ে দুজন ফালতু লোক রাখার। আর কোনো মানে হয় না। জলিল সাহেবকে আজই বলে দিতে হবে।

বদলি নাকচ করার চেষ্টাও শুরু করতে হবে আজ থেকে। এখন ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বছর খানিক কোথাও নড়াচড়া করা যাবে না। ঢাকা শহরে গ্যাট হয়ে বসে থাকতে হবে। অনেক কাজ হাতে।

.

মনসুর সাহেবের বাড়ির সামনে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি সংক্রান্ত নতুন কোনো ঝামেলা না তো? অন্য কেউ কি এসে দখল নিয়ে নিয়েছে?

মনসুর সাহেবের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। বমি বমি ভাব হলো। জলিল সাহেবকে দেখা গেল এগিয়ে আসছেন।

মনসুর সাহেব, ভাই একটা খারাপ সংবাদ।

খারাপ সংবাদ? কী খারাপ সংবাদ?

মনসুর সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। কপালে ঘাম জমল। লোকজনের কথাবার্তা অস্পষ্ট হয়ে গেল। তার পা কাঁপছে। জলিল সাহেব এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেললেন।

আপনার স্ত্রী হঠাৎ করে...

মারা গেছে নাকি?

সবই আল্লাহর ইচ্ছা ভাই। মনটাকে শক্ত করেন।

জলিল সাহেব তাঁকে ধরে বারান্দায় রাখা একটি ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

মনসুর সাহেবের এখন হয়তো কাঁদা উচিত। কিন্তু কাঁদতে পারছেন না, নিশ্চিত বোধ করছেন। জীবন এখন নতুন করে শুরু করা যাবে। তবু মনসুর সাহেব কাঁদতে চেষ্টা করলেন। আশেপাশে প্রচুর লোকজন এসেছে, তারা শোকের প্রকাশ দেখতে চায়। শোকাহত একজন মানুষকে সান্ত্বনার কথা বলতে চায়। এরাই এখন ছুটাছুটি করবে। মৌলবি ডেকে আনবে। খাঁটিয়ায় কাঁধ দিয়ে সুর করে বলবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু।'

মনসুর সাহেব বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। গভীর বেদনার সুরে ডাকলেন, কদম! ও কদম! জলিল সাহেব তাঁকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন। প্রতিবেশীরা তাঁর পাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। তাদের চোখ মমতায় আর্দ্র। মনসুর। সাহেব আবার ডাকলেন, কদম! কদম! তার শ্বশুর ফুলের নামে মেয়েদের নাম রেখেছিলেন–বেলি, কদম, যূই...।

একজন ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক মনসুর সাহেবের হাত ধরে বললেন, মৃত মানুষের নাম ধরে ডাকতে নাই ভাই। আল্লাহকে ডাকেন। আল্লাহ শান্তি দেনেওয়ালা। এখন ভেঙে পড়ার সময় না। অনেক কাজ সামনে। কোথায় মাটি দিবেন ঠিক করেন, তারপর বাকি যা করবার আমরা করব।

কদমের মৃত্যুর সময়টা খারাপ হয়নি। ভালোই হয়েছে বলা চলে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হলো। যোগাযোগের দরকার ছিল। এখন বাড়িসংক্রান্ত কোনো বিপদে এদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

কবর দিতে হবে এখানেই। এতে একটা অধিকার আসে। মনসুর সাহেব মুখ বিকৃত করে আবার ডাকলেন, কদম! ও কদম! জলিল সাহেবের চোখ ভিজে উঠল।

মৌলবি চলে এসেছে। তার সঙ্গে মাদ্রাসার দুটি ছাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে কোরান পাঠ শুরু হয়ে গেল। এ-বাসা ও-বাসা থেকে মহিলারা আসতে শুরু করেছে।

.

১৮.

বুলুর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বাথরুমে এখন আর যেতে পারে না। বেড প্যান ব্যবহার করতে হয়। নার্সারা বেড প্যান নিয়ে এলে বুলুর সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে করে। বড় লজ্জার ব্যাপার। তবে লজ্জাবোধটা তার দ্রুত কমে আসছে। এখন সে পড়ে থাকে আচ্ছন্নের মতো। বোধশক্তি দ্রুত কমে যাচ্ছে। মানুষের চেহারাও এখন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট মনে হয়। সোবাহান যখন তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিসরে বুলু?

বুলু বিস্মিত হয়ে বলল, কে?

আমি। আমি সোবাহান। চিনিতে পারছিস না নাকি?

পারছি। বোস।

রেশমা এসেছিল?

এসেছিল। আবার আসবে।

কেমন লাগছে রে?

ভালো না।

সোবাহান বসে রইল চিন্তিত মুখে। বুলু থেমে থেমে বলল, তোর অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিয়েছি। রেশমা নিয়ে গেছে। হবে!

কিসের কথা বলছিস?

আমার যে চাকরির কথা ছিল সেইটা। সাত হাজার টাকা দেওয়া আছে। খেলার কথা না। আমি যখন নিতে পারছি না তোকে দিক।

তুই নিতে পারছিস না মানে?

হালুয়া টাইট রে ভাই। বাঁচব না।

কী ছাগলের মতো কথা বলছিস?

এইসব জিনিস বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারছি।

বুলু চুপ করে গেল। মিনিট দশেক তার আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সোবাহান বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারটে টেনে আবার ফিরে এল। বুলুর মামা এসেছেন। হাতে প্রকাণ্ড সাইজের একডজন কলা। বুলু বলল, কলাগুলি ঢেকে রাখেন মামা। দেখলেই বমি আসছে।

একটা খা। ছিলে দেই?

দেখেই বমি আসছে, খাব কী! ঢেকে রাখেন।

বুলু ক্লান্তস্বরে ডাকল, সোবাহান।

বল।

চাকরিটা নিস। ঝামেলা করিস না। আমার সাত হাজার টাকা লাগানো আছে।

হুদা সাহেব বললেন, কিসের সাত হাজার টাকা?

আছে আছে, আপনি বুঝবেন না।

বুলু চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল।

.

কদম নেই–এই কথাটি যতবার মনে হয় ততবারই মনসুর সাহেব মনে অন্যরকম একটা স্বস্তি বোধ করেন। মনসুর সাহেবের মেজাজও অনেক ভালো হয়েছে। গত তিনদিন যুঁথির সঙ্গে উঁচুগলায় কথা বলেননি। রাতেরবেলা খেতে বসে রান্নার প্রশংসাও করলেন।

তরকারিটা ভালো হয়েছে যূথি।

আরেকটু দেই?

দাও। কাঁচামরিচ আছে?

আছে।

দাও দেখি। কাঁচামরিচটা শরীরের জন্যে ভালো। প্রচুর ভিটামিন সি।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি অনেকক্ষণ গল্প করলেন। দোতলাটা ভাড়া দেবেন? না দোতলায় উঠে গিয়ে নিচতলাটা ভাড়া দেবেন।

যূথি, কম্পাউন্ড ওয়ালটা আরও উঁচু করে দিতে হবে। লোহার একটা ভারী গেট দেব। কী বলো?

দেন।

নারকেল গাছের দু'টো চারা এনে লাগাব, বাড়ির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। ঠিক না?

জি।

চা দাও তো এক কাপ। দুধ দিও না। লেবু দিয়ে দাও।

সেই রাতে মনসুর সাহেবের ঘুম এল না। রাত দু'টা পর্যন্ত জেগে রইলেন। তারপর ডেকে তুললেন যূথিকে। যূথি কাঁদতে শুরু করল। মনসুর সাহেব গাঢ়স্বরে বললেন, আহ্ কাঁদো কেন? তোমাকে আমিই বিয়ে করব বৃথি। ঘরসংসার তো করতেই হবে। হবে না?

মনসুর সাহেব দুপুররাতে গাঢ়স্বরে নানান রকম সুখের কথা বলতে লাগলেন।

.

সোবাহান বলল, জলিল সাহেব, মেয়েটা কাঁদছে। জলিল সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েরা খুব মায়াবতী হয় রে ভাই। অল্প দুঃখেই কাঁদে। আর এর বোন মারা গেছে। সহজ দুঃখ তো না। কাঁদবেই তো। সারা রাত কাঁদবে।

সোবাহান কিছু বলল না। জলিল সাহেব মৃদুস্বরে ডাকলেন, সোবাহান সাহেব।

বলেন।

বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, শুনেছেন তো?

শুনেছি।

কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?

না।

কুমিল্লা বোর্ডিং-এ যাবেন নাকি?

আপনি কি ওইখানেই যাবেন?

হ্যাঁ। জলে ভাসা মানুষ আমি। হোস্টেল বোর্ডিং এইসব ছাড়া যাব কোথায় বলেন? ঘরসংসার করার শখ ছিল, অভাবের জন্যে পারলাম না।

সোবাহান উত্তর দিল না। জলিল সাহেব বললেন, ঘুমোবেন না?

ঘুম আসছে না।

রাস্তায় হাঁটবেন নাকি?

না। বারান্দায় বসে থাকব খানিকক্ষণ।

দু'জন এসে বারান্দায় বসল। অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। মেয়েটা কাঁদছে। গভীর রাতে মেয়েদের কান্না শুনতে এত ভালো লাগে কেন কে জানে!

.

১৯.

১৯ অনেক লোকজন আসে ফরিদ আলির কাছে।

দুঃখী মানুষেরা শান্তির কথা শুনতে চায়। দূর দূর থেকে তারা আসে। গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে। ফরিদ আলি ভরাট গলায় কথা বলেন। গলার স্বর কখনো উঁচুতে ওঠে না, নিচুতেও নামে না। অবাক হয়ে সবাই তার কথা শোনে। তাদের বড় ভালো লা

আজ সবাই শুনছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছে। শান্তির কথা বলতে বলতে ফরিদ আলির চোখ ভিজে উঠল। তিনি বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলেন। ভাঙা গলায় বললেন, আজ আর কিছু বলব না। আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হবে। ফরিদ আলি গভীর রাত পর্যন্ত একা বসে রইলেন বাংলাঘরে। একসময় পারুল এসে বলল, ভাত খাবেন না?

না।

নামাজঘরে যাবেন?

না, নামাজঘরেও যাব না।

তিনি পারুলের সঙ্গে ভেতরের বাড়িতে চলে এলেন। পারুল তাঁকে একটি জলচৌকি এনে বসতে দিল। তিনি উঠোনে বসে রইলেন।

আপনাকে এক কাপ চা এনে দেই?

দাও।

পারুল চা নিয়ে এল। ফরিদ আলি মৃদুস্বরে বললেন, আমার পাশে একটু বসো পারুল।

পারুল উঠানেই বসতে গেল।

জলচৌকিতেই বসো। দু'জনাতে বসা যাবে।

লোকজন আছে। কে না কে দেখবে।

দেখুক।

পারুল সংকুচিতভাবে বসল তার পাশে। অস্পষ্ট স্বরে বলল, সোবাহান কী লিখেছে?

ফরিদ আলি জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

ওর চিঠিটা আমাকে পড়তে দেন।

ফরিদ আলি সে-কথারও জবাব দিলেন না। চিঠিটা পড়তে দেওয়ার তার কোনো। ইচ্ছা নেই। অর্থহীন কথাবার্তা লেখা সেখানে। রাতে নাকি তার ঘুম আসে না। লক্ষ লক্ষ মশা কানের কাছে পিন পিন করে। কোনো মানে হয়? চিঠির শেষে লেখা–ভাইজান, বড় কষ্ট।

ফরিদ আলি মৃদুস্বরে বললেন, ওকে দেশের বাড়িতে নিয়ে আসব। ওর বড় কষ্ট।

.

২০.

দুপুর থেকেই রেশমা ও সোবাহান বসে ছিল বুলুর পাশে। সোবাহান কয়েকবার ডাকল— বুলু! বুলু! বুলু তাকাল ঘোলা চোখে, জবাব দিল না। তিনটার দিকে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হলো। রেশমা একজন ইন্টার্নি ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এল। সে মুখ কালো করে খবর দিতে গেল রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, আপনারা কি রোগীর আত্মীয়?

রেশমা ভাঙা গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমার মনে হয় পেসেন্ট কোমায় চলে যাচ্ছে। অবস্থা বেশ খারাপ।

রেশমা তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে চাইল, বলতে পারল না।

আমরা পেসেন্টকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে যাচ্ছি।

সোবাহান বলল, এতটা খারাপ?

হ্যাঁ, বেশ খারাপ। পালস্ প্রায় পাওয়া যাচ্ছে না।

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান দ্রুত চলে গেলেন। সোবাহান বলল, রেশমা, তুমি চেয়ারটায় বসো। তোমার পা কাঁপছে। পড়ে যাবে।

রেশমা বসল না, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বুলু মারা গেল বিকাল চারটায়। নিঃশব্দ মৃত্যু। কোনো হৈচৈ হলো না। গলা ফাটিয়ে কেউ কাঁদতে বসল না। রেশমা ও সোবাহান হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়ে বুলুর মৃত্যুসংবাদ সহজভাবে গ্রহণ করল। রেশমা ধরাগলায় বলল, একটা রিকশা ঠিক করে দেন সোবাহান ভাই। বাসায় যাব।

খুব মেঘ করেছে আকাশে। বাতাস দিচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে আজও হয়তো ঝড় হবে। সোবাহান মৃদুস্বরে বলল, একা একা যেতে পারবে?

পারব।

আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি?

না। আপনি এখানে থাকেন। সোবাহান ভাই।

বলো।

বুলুর ওই চাকরিটা আপনার হবে। ওরা আমাকে কথা দিয়েছে। যদি হয় তাহলে আপনি দয়া করে চাকরিটা নেবেন।

সোবাহান কিছু বলল না। রেশমা চোখ মুছে মৃদুস্বরে বলল, বুলু শেষের দিকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যাতে আপনি চাকরিটা পান। বুলুর বড় কষ্টের চাকরি সোবাহান ভাই।

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বাতাসের বেগ বাড়ছে। রেশমার রিকশা বাতাস কেটে এগুচ্ছে খুব ধীরে।

.

সোবাহান বাড়ি ফিরল অনেক রাতে। সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবে আছে। প্রচণ্ড কালবৈশাখীতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সব। শহরটাকে লাগছে গহীন অরণ্যের মতো। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। কী অদ্ভুত লাগে জনশূন্য অন্ধকার রাজপথে হাঁটতে। হাওয়ায় সোবাহানের সার্ট পতপত করে ওড়ে। চোখেমুখে পড়ে বৃষ্টির মিহি কণা।

সোবাহান তার ঘরের বারান্দায় উঠে এল নিঃশব্দে। চারদিক অন্ধকার। রাত কত হয়েছে? সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সোবাহান মৃদুস্বরে ডাকল, যূথি! যূথি!

কেউ সাড়া দিল না। সোবাহান গলা উঁচিয়ে দ্বিতীয়বার ডাকল, যূথি! যূথি!

মনসুর সাহেব বেরিয়ে এলেন। জলিল সাহেব এলেন। যূথিও এল। তার হাতে একটা হারিকেন। সে তাকাল অবাক হয়ে। সোবাহান ভাঙা গলায় বলল, যূথি, আমার আজ বড় কষ্ট।

যূথি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর এগিয়ে এসে তার দুর্বল রোগা হাতটি রাখল সোবাহানের গায়ে। বাতাসের ঝাঁপটায় তার অন্য হাতের হারিকেনটি দুলছে। চমৎকার সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে।

যুঁথি নরম স্বরে বলল, কাঁদবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুই ঠিক হয় না। তবু মমতাময়ী নারীরা আশ্বাসের কথা বলে। আশ্বাসের কথা বলতে তারা বড় ভালোবাসে।